কয়েকটি মানুষের সোনালি যৌবন

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. বাবা শখ করে নাম রেখেছিলেন রজনী 2
২. পীরজাদার ইনভাইটেশন ছিল 23
৩. হোটেল কোলামবাস 32
৪. মনের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড 58
৫. খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো 87

১. বাবা শখ করে নাম রেখেছিলেন রজনী

বাবা শখ করে নাম রেখেছিলেন রজনী। গায়ের রং ছিল ভোরের কেবল সূর্য উঠতে থাকা অন্ধকারের মতো, ওরই মধ্যে যেন একটুখানি দীপ্তির আভাস। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই রং তার সারাটা মুখে এমন এক সারল্য এনে দিয়েছিলো, যেন অখণ্ড এক মমতার ছবি চোখে দেখা যাচ্ছে। সেই মেয়ে, সেই রজনী, একুশ বছরের বিপজ্জনক বয়সে ঘর পালাবে কেউ ভাবেনি।

কেউ না। রজনী নিজেও না। মানুষ তো তার নিজের সব কথা নিজে জানতে পারে না। রজনীই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

একদিন দুপুরে গেল কলেজে। তিনবার আই, এ, ফেল করবার পর চতুর্থ বারের মতো পড়া চলছিল। আর আই, এ পাশ না করলে যে আজকাল ভাল বর পাওয়া যায় না এ সত্যটা বাড়ি থেকে পাঁচনের মতো দুবেলা তাকে গেলানো হচ্ছিল। আজকাল বাবা যখন ডাকেন রজনী বলে সে ডাকে আদরের আভাস মাত্র থাকে না। সে যে ভাগ্যহীনা, সংসারের গলায় মশলা পেষা পাথরের মতো দুর্বহ-ভার, সেই তিক্ততাটুকু ফুটে বেরোয়।

সেদিন রজনী গেল কলেজে। কলেজ থেকে সন্ধ্যের প্লেনে সোজা করাচি।

একা নয়। সঙ্গে একজন। রজনীদের দুবাসা পরের পুরোনো দোতলার মেজ ছেলে মহসিন। লেখাপড়া প্রায় কিছুই না করে ডা ডা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুদর্শন চেহারাটাকে মূলধন করে। একদিন মায়ের কাছ থেকে হাজার দুয়েক টাকা পাওয়া গেল। মা বললেন, ব্যবসা কর, কিছু একটা কর, নইলে আমি আত্মঘাতী হবো। সে টাকাই হলো কাল। দুহাজার টাকা মহসিনের কাছে মনে হলো কুড়ি হাজার টাকার মতো। রজনীকে সে ভালবাসত। আর তিনবার আই, এ, ফেল করা, সংসারে সবার কাছে সংকুচিতা রজনী মহসিনের মতো সুদর্শন একজনের কাছ থেকে হৃদয়ের পরম প্রশ্রয় পেয়ে মনে মনে হৃদয়টাকেই তার পায়ের তলায় সমর্পণ করেছিল। সেই তাকে নিয়ে মহসিন ঝাঁপিয়ে পড়ল সংকেতহীন ভবিষ্যতের খাদে।

কিছুদিন থেকে রজনী তার বুকের মধ্যে শুনতে পেত দুয়ার ভাঙ্গার আহ্বান।

শুনতো, শুনে শিউরে উঠতো। মহসিন বলত, আমি একদিন আসবো, ঝড়ের মতো তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবো।

ছোটবেলায় ইতিহাসে পড়া পৃথ্বি-রাজ সংযুক্তার গল্প আর সেই সঙ্গে আঁকা একখানা ছবি চমক দিত রজনীর মনে। সে দেখতে পেত, ঠিক ছবিতে যেমন আঁকা, মহসিন ঘোড়ায় চড়ে কোলসাপটা করে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তার ভয় করত, কিন্তু ভাল লাগত। ফুলের গন্ধ পেত রজনী। চোখে আলো দেখত। মানুষের কোলাহল শুনতে পেত। মহসিনের সঙ্গে তার বিয়ের রাতটা খণ্ড খণ্ড ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠতো। আনন্দে, উদ্বেগে, অন্ধকার ঘরে বালিশ বুকে চেপে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকত রজনী।

রজনীর পিঠে একদিন মার পড়েছিল। মহসিনের একটা চিঠি পড়েছিল বাবার হাতে। বাসার চাকর ছোঁকরাটি ফিরছিল বাজার করে। তার থলের মধ্যে চিঠিখানা পুরে দিয়েছিল মহসিন। বলেছিল, বুবুর হাতে বাজারের থলে দিবি।

কিন্তু তা আর হলো না। রজনীর বাবা ছিলেন বারান্দায়। বাজার দেখবার জন্যে চাকরটার হাত থেকে থলে নিয়ে উপুড় করতেই দিব্যি ভাঁজ করা চিঠি বেরুলো। পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে টুবুলের আঁক কষা স্কেল দিয়ে মারলেন রজনীকে।

রজনীর পিঠ লাল হয়ে উঠেছিল। ব্যথা করছিল। খানিকক্ষণ পর ব্লাউজটা শরীরের সঙ্গে টেনে ধরেছিল কাঁচা রক্ত শুকিয়ে গিয়ে। তিন দিন গেল না কলেজে। সেই তিনটে দিন মহসিন বাসার চারপাশে ঘুরঘুর করল। এবং অবশেষে সেই চাকর ছোঁকরার মুখ থেকেই শুনলো আদ্যোপান্ত ঘটনা। শুনে প্রথমে সরে গেল রজনীদের বাসার ত্রিসীমা থেকে। রজনীর বাপের চোখে পড়াটা বোধহয় মধুর হবে না, আর এ তিনদিনে যে তাঁর চোখে আদৌ পড়েনি সেজন্যে ভাগ্যতারাকে ধন্যবাদ দিল। পালিয়ে পালিয়ে কী ভাবল কে জানে, প্রায় দিন দশেক পর রজনীকে যখন গলির মোড়ে কলেজ ফেরত পাওয়া গেল তখন মহসিন বলল, বাপ না ডাকাত। বোলো তোমার বাপকে, আমার মতো জামাই পেলে ধন্য হয়ে যাবে।

রজনী বলল, বাবা তোমার কাছে বিয়ে দিলে তো।

কেন? না দিক তো বয়েই গেল। তুমি চলে আসবে, বাইরে বিয়ে হবে। আজকাল কত হচ্ছে। তাছাড়া খরচাপাতিও নেই। বরং আজকাল বাপ মা তাই চাচ্ছে, তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ।

অসম্ভব!

কী অসম্ভব?

সে পারবো না।

কেন? বাহ।

কক্ষনো না। ততক্ষণে বাসা প্রায় দেখা যাচ্ছে। মহসিন দাঁড়িয়ে রইল। রজনী মাথা নিচু করে বই খাতা কোলের পরে অদল বদল করতে করতে বাসায় গিয়ে ঢুকলো। তারপর সোজা বাথরুমে। সেখানে বসে বসে ভাবলো মহসিনের কথা। রজনী খানিকক্ষণ কাঁদলো। আবছা করে তার মনে পড়ল দুএকজন বান্ধবীর কথা, একটা ভালো মোটর গাড়ি কবে দেখেছিল সেটা, কবে একদিন রজনী কলেজ থেকে এসে দেখে ঢাকা তার তরকারি বেড়ালে খেয়েছিল সেই কথা। এইসব বিচ্ছিন্ন ছবিগুলো কারণহীন এসে ভিড় করলো এবং তাকে কাঁদালো!

বাড়ি পালানোটাও অদ্ভুত। কলেজে ঢুকতে যাবে, দেখে গেটের সামনে মহসিন দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে দেখেই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, চল, তোমার সাথে কথা আছে। এবং ভালো করে কিছু বোঝা বা বলার আগেই রজনী দেখে কখন মহসিনের সঙ্গে এক রিকশায় উঠে বসেছে সে। রিকশা চলছে মেডিক্যাল কলেজের সমুখ দিয়ে। অত বড় দালানে কয়েকশ লোক একসঙ্গে শুয়ে রোগেব যন্ত্রণায় কাত্রাচ্ছে, কী মারা যাচ্ছে এই উপলব্ধিটা রজনীর সেদিন হয়েছিল আর জীবনের প্রতি একটা আচমকা বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল।

তাকে নিয়ে মহসিন সেদিন সারাদিন ঘুরলো। যে কথাটা বারবার জিগ্যেস করল তা হচ্ছে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা বল।

প্রথমবার যখন জিগ্যেস করেছিল তখন রজনীর মনে হয়েছিল ঠাট্টা। দ্বিতীয় বার মনে হয়েছে, একটা খেয়াল। পরে যখন আবারো জিগ্যেস করেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছে। ঠাট্টাও নয়, খেয়ালও নয়, মহসিন তাকে সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চায়।

গায়ে তার কাঁপন লাগল, সংযুক্তার মতো তারও বুঝি তবে পালা এসেছে লুট হয়ে যাওয়ার। রজনীর কাছে এটা একটা অভিনব ব্যাপার যে কেউ তাকে এত কাছে থেকে, একেবারে চোখ মুখ হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যায় এত নিকট থেকে, বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে। নিজেকে তার অমিত ভাগ্যবতী বলে মনে হলো। মনে হলো, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের কোটি কুমারীদের ওপর জিৎ হয়ে গেছে তার। সে হাসলো। রজনী মাথা কাৎ করে জানাল, তার এতে অমত নেই।

তখন মহসিন বেরিয়ে গেল। বলে গেল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরছে। রেস্তোরাঁর কেবিনে একা বসে রইলো রজনী। বসে বসে তার অস্বস্তি করতে লাগল। ছটফট করতে লাগল। এই মুহূর্তে যদি বাইরে গিয়ে খানিকটা ছুটোছুটি করতে পারতো, নাচতে পারতো, ছোট ভাইটার গলা জড়িয়ে ধরতে পারতো কী বাসার ছাদে খুব করে হাঁটতে পারতো রজনী, তো ভালো লাগতো। তার বদলে খাতায় পাখি আঁকলো, নাম লিখলো, অনেকগুলো পাতা নষ্ট করলো। এমনি করে। অবশেষে মহসিন ফিরে এলো। তখন শেষ বিকেল। চোখের পাতার মতো ফিকে লাল হয়ে যাচ্ছে আকাশটা। মানুষ বাড়ি ঘর মোটরের ছায়াগুলো লম্বা লম্বা দেখাচ্ছে। বেরিয়ে এসে রজনী জিগ্যেস করল, কোথায়?

এসো আমার সঙ্গে। এয়ারপোর্টে এসে সে বলল, রজনী আমরা করাচি যাচ্ছি।

না, না। কেন?

তুমি বুঝতে পারছ না, রজনী, আমি তোমায় বিয়ে করব। আমার সঙ্গে অনেক টাকা আছে। আমি একটা কাজ নেব। বাঙালিদের কত কাজ সেধে দিচ্ছে করাচিতে। তোমার নিজের সংসার হবে, যেখানে কেউ তোমাকে বকবে না। আমরা, আমরা মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসবো দেশে।

না, না।

কী না–না? তোমার বাবা আমাকে দুচোখ দেখতে পারেন বলছ?

তা নয়।

তাহলে, আমার সঙ্গে টাকা নেই মনে করছ?

না।

তবে, তবে কী?

না, না।

আমি কিসসু বুঝতে পারছি না কেন তুমি না–না করছ।

মহসিন অত্যন্ত চটে গিয়েছে। সেটা লক্ষ্য করে মনটা ভারী ছোট হয়ে গেল রজনীর। অথচ এইটে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলো না যে, আপত্তিটা তার গোড়াতেই। বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে না কয়ে কী করে চলে যায়। আর বিয়েই বা করে কী করে? তার বাবার মুখ মনে পড়ল। রজনী যেন দেখতে পেল, অফিস থেকে ফিরে এলে তার যেমন হয়, তেমনি খুব উদ্বিগ্ন বিব্রত দেখাচ্ছে বাবাকে।

অথচ এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছে না মহসিন তা ভেবে অবাক লাগল তার। একবার কী বলতে চেষ্টাও করল, কিন্তু থেমে গেল। মহসিন এমন একটা প্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো বলছে যে, রজনীর খানিকটা বিশ্বাস হচ্ছে জীবনে এ রকমটি হতেও পারে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক। এবং সে যদি প্রতিবাদ করে তো ওই মহসিনের কাছে নিছক একটা ভীরু বলে লজ্জা পেতে হবে তাকে।

এই রকম যখন সংকট তখন মহসিনই যেন দেবতা হয়ে দাঁড়াল। বলল, অবশ্যি তোমার ভয় করলে আলাদা কথা। তুমি ফিরে যাও। আমি জোর করব না। আমি যাব।

কোথায়?

যেখানে তোমাকে যেতে বলেছিলাম। আমাকে আজ যেতেই হবে। আমি আর একটা দিনও থাকছিনে। পোড়ার দেশে থেকে কী হবে?

রজনীর খুব ভয় করলো! মহসিন একা কোথায় কোন বিদেশে গিয়ে মুখ থুবড়ে মরে থাকবে, কী দেখা শোনার কেউ থাকবে না—-এই ভাবনাটা কষ্ট এনে দিল রজনীর মনে। তার জিদ দেখে আরো মনে হলো লোকটার কপালে দুঃখ নিশ্চিত লেখা আছে, ভাগ্য তাকে টানছে। শিউরে ওঠে মেয়েটা। বড় বড় চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইলো মহসিনের দিকে। এই লোকটা যাবে চলে, আর সে থাকবে এখানে, হয়ত এবারও ফেল করবে, বাবা আর পড়াবেন না বলে দিয়েছেন, ছোট ভাইটা পর্যন্ত ইতিমধ্যে তাকে তুই বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে, কেননা সে অবধি বুঝে গেছে তার বোনের আর আদর

নেই—- রজনী আর ভাবতে পারলো না। ভীরু গলায় একবার শুধোলো, এখানে থেকে কিছু হয় না?

এখানে থেকে আমি কিছু করতে চাই না।

আর প্রতিবাদ করল না রজনী।

রাত একটার সময় তাদের প্লেন পৌঁছুলো করাচি। তারা উঠলো হোটেল কোলামবাসে। তেতলার ঘরে।

.

পীরজাদা হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যে রাজার ঘরে জন্মালে মুকুট হারাতে, কোটালের ছেলে বসতো তার সিংহাসনে। নেহাৎ একালে জন্ম বলে রাজ্যও তার হারায়নি, একবস্ত্রে দেশত্যাগও করতে হয়নি, কিন্তু যা হারিয়েছে তার বেদনা সাত রাজাতেও সারিয়ে দিতে পারবে না।

দেশত্যাগের বদলে বৃহত্যাগ কবেছে পীরজাদা। আজ আড়াই বছর ধরে হোটেল কোলামবাসের তেতলার শেষ দক্ষিণ ঘরখানা তার আশ্রয়। একদিকে জানালা খুললে দূরে আরব সাগরের ইশারা, আর এক দিকের জানালায় শাহরাহ ইরান পেরিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের শেষ প্রান্তে মালার মতো মেলারাশি প্রাসাদের বীথি। রাতে ঐ দূর

দালানগুলো থেকে অসংখ্য আলোর ডট অন্ধকারকে চন্দনফোঁটার মতো সাজিয়ে রাখে। পীরজাদা যেদিন অত্যধিক মদ্যপান করে চোখের তীব্রতা হারিয়ে ফেলে, সেদিন তার মনে হয় এক সুন্দরী, যার মুখ নিকষ কালো সে প্রসাধন করে অধীর অপেক্ষা করছে। তাকে স্পর্শ করা যাবে না, তার আর কোন অঙ্গ দেখা যাবে না, তার আসন দেখা যাবে না—- সে শুধু তার বিশাল মুখ সজ্জিত করে রাতের পর রাত অপেক্ষা করবে। তার মাথার চুলে চক্রের মতো ঘুরবে তারকাপুষ্প।

যে পীরজাদা সুন্দরী তরুণী দেখলে শিউরে উঠত, মনে মনে এবং কখনো কখনো সরবে তাদের গাল দিত বাস্টার্ড, হাসি, বেশ্যা বলে সেই পীরজাদা যখন এই সব রাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ঐ আলোর মধ্যে নিকষ কালো কল্পনার মহিলাকে দেখতে পেত তখন তার মনে হতো ভেতর থেকে বুক খালি করে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাথার মধ্যে তখন সুরার সেতার বাজছে। সে রেলিং–এ ঝুঁকে পড়ে প্রলাপ বকতো আর কাঁদতো।

বন্ধুদের রীতিমত শক্তি প্রয়োগ করতে হতো পীরজাদাকে তখন বারান্দা থেকে ঘরে আনতে। এটা একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, সুরা পানের আসর থেকে পীরজাদাকে কেউ একা বারান্দায়। বেরুতে দিত না। তাকে চোখে চোখে রাখা হতো।

কিন্তু যারা পাহারা দেবে তারাও তো মদ খেতেই বসেছে। তাদের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে। কে আর কাকে রাখবে চোখে? তখন পীরজাদা বেরুতো বারান্দায়। আর ঘটতো

এই কান্ড। নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে যেত। কারণ তার মনে হতো, পীরজাদা বুঝি রেলিং থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছে।

অবশ্যি সে ইচ্ছে থাকলে আজ থেকে আড়াই বছর আগেই সব শেষ হয়ে যেত। তার কবরের পরে ঘাসের শীষ ঘন হয়ে উঠত এতদিনে। তবে সুদর্শন অগ্নিসম্ভব গায়ের রং, কয়লা রং স্যুট পরা, নীল চোখ, দীর্ঘ এই মানুষটাকে জীবিত বলাও ভুল। কারণ, পীরজাদা মনে মনে জানে তার বেঁচে থাকার এখন একটি মাত্রই উদ্দেশ্য, আর তা হচ্ছে এই ছফুট দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ লাশটা যদ্দিন না মাটির তলায় যাচ্ছে তদ্দিন মাটির ওপরে তাকে বাঁচিয়ে রাখা। আর সম্ভবত তাই নিয়ম বা অনিয়মের ভেদাভেদ নেই তার কাছে। রাত চারটেয় তার শোবার সময়, দুপুর এগারোটায় ব্রেকফাস্ট, তিনটেয় লাঞ্চ, ডিনারের কথা কোনদিন মনে থাকে কোনদিন থাকে না। সাতদিন অফিসে ভূতের মতো কাজ করতে পারে এক লহমার বিশ্রাম না নিয়ে, আবার তিনদিন একটানা ঘুম থেকে বুঝি আজরাইলও টেনে তুলতে পারবে না। মদ স্পর্শ করবে না মাসের পর মাস, আবার বসলে বড় একটা বোতল বিরতিহীন পান করে কারো সাহায্য না নিয়ে নিচ তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে অন্ধকারে চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলে পোশাক বদলে ঘুমোতে যেতে পারে একটুও না টলে, ভুল না করে।

এর শুরু সেই আড়াই বছর আগে।

তারো তিন বছর আগের কথা। পীরজাদা তখন সদ্য বিলেত ফেরত, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সীতে সাফল্যের সঙ্গে ওত্রানো ছেলে। দেশে ফিরে চাকরি নিল না। বাবা

বললেন, আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি ফার্ম করো। বাবাকে একালের ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি শ্রদ্ধা করতে পীরজাদা। চাকরির অফারটা ছিল ভালো। কিন্তু সেটা তক্ষুনি ফেরৎ পাঠিয়ে ফার্ম করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল সে।

কয়েক মাস পর সুদূর গুজরানওয়ালা থেকে বাবা লিখলেন, আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। আশঙ্কা হচ্ছে বাচবো না। তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছ এবং ইতিমধ্যে অনেকখানি। প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছ এটা পিতা হিসেবে আমার পরম আনন্দের কারণ। কিন্তু তবু বলবো, এ আনন্দ সম্পূর্ণ নয়। তুমি সংসারী হও। পুত্রবধূর মুখ না দেখে মরলে বেহেস্তে গিয়েও শান্তি পাবো না। তোমার ওপর আমার অসীম আস্থা আছে। আমি একটি সুলক্ষণা, সর্বগুণসম্পন্না, সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছি। পত্র পাওয়া মাত্র বাড়ি চলে এসো। আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রে শুভদিন ধার্য হয়েছে।

পীরজাদা এলো গুজরানওয়ালায় সেই রাতেই ট্রেন ধরে। এবং যথানিয়মে বৃহস্পতিবারও এলো। পরিবারের বড় ছেলের বিয়েতে তিনদিন তিনরাত রোশনাই হয়ে থাকল সারা মহল্লা। চতুর্থদিনে পীরজাদা বউ নিয়ে ফিরলো করাচি। সুন্দরী সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জগতের মেয়ে।

পীরজাদার বাবা সন্ধান রাখতেন না, তার ছেলের জীবনে পরিবেশের কতখানি পরিবর্তন হয়েছে ছবছর বিলেত বাসের ফলে। যে সুলক্ষণা মেয়েটিকে তিনি ছেলের জীবনসঙ্গিনী করে দিলেন, সে সলাজ, সন্ত্রস্ত এক গেঁয়ো বালিকা। পীরজাদা যে সমস্ত বান্ধবীদের সঙ্গ পেয়ে অভ্যস্ত তাদের কলরব মুখরিত বিদ্যুৎ চমকিত উপস্থিতির পাশে এ মেয়ে যেন

মাটির প্রদীপ। প্রথম কদিন স্তব্ধ হয়ে রইলো লোকটা। এমন কী একে আত্মনির্বাসনও বলা যেতে পারে। প্রায় এক পক্ষকাল করাচিতে থেকেও পীরজাদার সাক্ষাৎ তো দূরে থাক তার সিগারেটের ছাইটুকু পর্যন্ত কেউ দেখতে পেল না। একদিন বিকেলে তার কয়েকজন বন্ধু, বন্ধুপত্নী আর একজোট অবিবাহিত বান্ধবী এসে অতর্কিতে বাসায় চড়াও হলো। সমস্বরে তারা বলল, কী এমন বউ পেয়েছ যে বাসা থেকে বেরুতেও চাও না? আমরা দেবী দর্শনে এসেছি।

লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেল পীরজাদা। এদের সামনে ঐ স্বল্পশিক্ষিতা, এক শতাব্দী পেছনে পড়ে থাকা, প্রচুর পোশাকে প্রায় সম্পূর্ণ আবৃতা তার স্ত্রীকে কী করে সে বার করবে? তার বান্ধবীদের চোখে যে দীপ্তি জ্বলছে, পীরজাদার মনে হলো, তা প্রস্তুত হয়ে আছে। উপহাসের জন্যে। পীরজাদাকে সেদিন গলদঘর্ম হতে হয়েছিল উদগ্রীব মানুষগুলোকে নিরস্ত করতে। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে তাদের তো পাঠানো গেল। এবং প্রতিজ্ঞা করতে হলো অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই স্ত্রীকে সে হাজির করবে তাদের দরবারে।

বলতে গেলে সে রাত থেকেই স্ত্রীকে আধুনিকা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল লোকটা। পীরজাদার একটা স্বভাব যখন যে কাজ করবে নিঃশ্বাস না নিয়ে করা চাই, আর যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। স্ত্রীর কোন ওজর আপত্তি টিকলো না, ঘরের কাজ মাথায় উঠলো রান্নাবান্না পড়ে রইলো, বসে বসে সে মুখস্ত করতে লাগলো সামাজিক কেতা–কানুনেব বুলি, নতুন ধরনের কাটা কামিজ পরে অস্বস্তির সঙ্গে শুরু হলো তার চলাফেরা, এক ফালি দোপাট্টায় শরীর বিব্রত হয়ে রইল, মুখে নানা রঙের

সমাবেশ মুখোশের মতো যন্ত্রণার সৃষ্টি করলো, নাক জ্বালা করতে থাকল সুরার গন্ধে, বাথ সলটে বমি। কিন্তু মাত্র দিন সাতেকের জন্যে।

এক পক্ষকাল যেতে না যেতে দেখা গেল পীরজাদার শাদা রেসিংকার, যেটা সে শখ করে আসবার পথে ইটালিতে কিনেছিল, সেটা সন্ধ্যায় কোনদিন সেজানে এসে দাঁড়াচ্ছে, কোনদিন বীচ লাকসারির কার পার্কে পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা শাহরাহ ইরান ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছে পুরনো ক্লিফটনের দিকে। রোববারে তো কথাই নেই, নিশ্চয়ই হস বেতে দেখা যাবে। এতকাল পীরজাদার পাশে একেক দিন একেক রূপসীর দেখা মিলত—-সিংহাসন কারো স্থির ছিল না কোন কোনদিন একাধিক আরোহিণীও চোখে পড়ত, মনে হতো হারেম লুট করে। রাজধানীতে ফিরছে যুবরাজ। কিন্তু এবারের আরোহিণী একজন, আর তাকেই দেখা গেল দিনের পর দিন, সন্ধ্যের পর সন্ধ্যে। দামেশকের তলোয়ারের মতো ঋজু ছিপছিপে এক তন্বী। চলনে সভা স্তব্ধ হয়, হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে। উদ্যত ফণিনীর মতো তার বঙ্কিম গ্রীবা, রক্তিম ঠোঁটে এক বিজয়িনীর স্মিত দম্ভ, শরীরের রং–এ সুরার জ্যোছনা, স্তনাগ্রে তীরমুখের তীক্ষ্ণতা আর চোখে সর্বনাশের ইঙ্গিত।

বন্ধুরা ছেঁকে ধরলো, কে এই নারী?

বান্ধবীরা ঘনঘন টেলিফোন করতে লাগল, শেষে কি স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে পীরজাদা?

পীরজাদা বাড়িতে একদিন বিরাট পার্টি দিয়ে লম্বা এক বাও করে বিনীত কণ্ঠে জানালো ইনিই আমার ধর্মমতে পরিণীতা স্ত্রী। সে রাতে তার স্বাস্থ্য পান করলো সকলে। বেগম পীরজাদার হাতে হাইবল কলিন্স যে নিখুঁত ভঙ্গিতে উত্তোলিত ছিল তা দেখে তাক লেগে গেল সবার। পুরুষেরা কয়েক জীগার পানীয় একসঙ্গে মাছের মতো পান করলেন। রমণীকুল নিঃশ্বাস এবং বিষ বাতাসে ছড়িয়ে রাত বারোটা বাজতে না বাজতেই ঘরে ফেরবার জন্যে হাই তুললেন। গর্বে বুক ফুলে উঠলো পীরজাদার। ভাবলো কিশতি মাৎ করেছি।

পার্টি শেষে শোবার ঘরে এসে স্ত্রীকে এক সশব্দ চুম্বন করে সেই বিজয়ের উল্লাস জ্ঞাপন। করলো সে।

পরদিন থেকে বান্ধবীর সংখ্যা কমলো পীরজাদার, কিন্তু বন্ধুর সংখ্যা বাড়লো। অনেক দূরের বন্ধু নিকট হলো, নিকটের বন্ধু নিয়মিত অতিথি হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে পীরজাদার ফার্ম জমে উঠেছে। এখন আর অবসরের দিন নেই তার। কিন্তু অফিসে যেদিন পীরজাদাকে অধিক রাত অবধি কাজ করতে হতো, সেদিনও তার স্ত্রীকে সঙ্গ দেবার জন্যে বন্ধুর অভাব হতো না।

সারাদিনের কাজ ক্লান্ত করে রাখতে পীরজাদাকে। কিন্তু নেশায় পেয়ে বসেছে তার স্ত্রীকে। হয়ত কোন রোববারে তাকে থাকতে হলো শহরে, তাতে কী? তার স্ত্রী বেরিয়ে পড়ল। ছুটিবার করতে ম্যানোরা দ্বীপে কী হক্স বে–তে। দীর্ঘদিন একরম চলবার পর, আতঙ্কিত হয়ে পীরজাদা লক্ষ্য করল তার হাতের তৈরি পুতুল প্রাণ পেয়েছে এবং তাকে

থামানোর কৌশল তার জানা নেই। যে বিশেষ বন্ধুটি তার স্ত্রীর জন্যে সহানুভূতি এবং সঙ্গদানে উদার তাকেও সে কিছু বলতে পারল না।

একদিন রাতে পীরজাদা ঘরে ফিরে বন্ধুটিকে দেখতে পেল বসে আছে, তার পোশাক থেকে রনিয়ে রনিয়ে উঠছে তার স্ত্রীর প্রিয় সুবাস। বন্ধু অল্পক্ষণ পরেই চলে গেল। পীরজাদার চোখে পড়ল স্ত্রীর শুভ্রকণ্ঠে সদ্য চুম্বনের চিহ্ন। বেয়ারার কাছে শোনা গেল, ভদ্রলোক বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে মেমসাহেবের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

সে রাতে কঠোর হওয়ার প্রথম ও শেষ চেষ্টা করেছিল পীরজাদা। তার ফল হলো এই, স্ত্রী খানিকক্ষণ কাঁদলো, বলল, আমাকে তবে মুক্তি দাও; বলল, আমাকে কেউ অবিশ্বাস করুক এ আমি চাইনে। পাঁচ দিন স্বামী স্ত্রীতে কথা বন্ধ হয়ে রইল। ষষ্ঠ দিনে পীরজাদা নতি স্বীকার করল। বলল, তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। সে রাতে আসলেই আমার মনটা ভালো ছিল না।

কিন্তু পীরজাদাও জানত, কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরেছে, স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, রক্তের মধ্যে কেবল আঁচ করা যাচ্ছে। তার অবস্থা তখন গভীর রাতে ঘুম ভাঙা এক বেড়ালের মতো যে একটা শত্রুর পদশব্দের জন্যে অপেক্ষা করছে।

গোড়ার দিকে বাবা পুত্রবধূর রূপান্তর দেখে শংকিত হয়ে চিঠি লিখেছিলেন। পীরজাদা সেদিন তার উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। চিঠিতে যখন সাবধান বাণীর আয়তন দিনে দিনে বাড়ছিল তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিল, এ বিয়ে আমার মতানুসারে হয়নি।

পছন্দটা ছিল আপনার, কিন্তু ঘর করতে হচ্ছে আমাকে। অতএব আমার পছন্দের সমান তাকে হতে হবে। তাই হচ্ছে।

এখন, এই মুহূর্তে তার মনে পড়ল বাবার কথা। মনে হলো, তার কাছে সান্তনা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাবার মতো মুখ নেই, মনোবলও নেই। একদিন তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়ে তিনি ইন্তেকাল করলেন। আজ তাকে বলবার আর কেউ রইলো না, কিন্তু আজকেই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল অমন একটা মানুষের। স্ত্রীর সামনে পিতার শোকে কাঁদার সাহসও পেল না লোকটা।

ওর একটা বহুদিনের পুরনো অভ্যেস ছিল, অফিস থেকে ফিরে এসে পোশাক বদলাতে বদলাতে হাফ পেগ হুইস্কি অনেকটা পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করা। একে বিলাসিতাও বলা যেতে পারে। প্রথমে লম্বা হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকত চেয়ারে—-তখন কয়েক চুমুক। যে। পোশাক বদলাতে পাঁচ মিনিট লাগার কথা নয় সেইটে সে বিরতি দিয়ে দিয়ে পনের থেকে বিশ মিনিটে বিস্তৃত করতো তখন গ্লাস নিঃশেষ। সুরার আসল স্বাদ পীরজাদা এই বিশেষ সময়টিতে যতখানি পেত আর কোন সময় তার সিকিও পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

এ ড্রিংক সে নিজে বানাতো, চিরকাল এটা ছিল উপভোগের আরেকটি অংগ। একদিন ঘরে ফিরে দেখল তার স্ত্রী বানাচ্ছে। দেখে অবাক হলো, খুশিও হলো। পাঁচদিন কথা না বলার সেই সময়টার স্মৃতি তখনো তাজা। তাই স্ত্রীর এই ব্যবহারে পীরজাদা অভূতপূর্ব এক অন্তরঙ্গতার স্বাদ পেল। এবং এটা যখন তার স্ত্রীর একটা নিয়মিত কাজ হয়ে

দাঁড়াল তখন তার হৃদয় থেকে সমস্ত মালিন্য সন্দেহ মুছে গিয়ে বইলো অনুরাগের নির্মল ঝর্ণা। সুখ বলতে পীরজাদার চোখের সমুখে তখন ভেসে উঠতো তার স্ত্রীর ছবি, যে হাসছে, যে এগিয়ে দিচ্ছে তাকে সারাদিনের ক্লান্তির পর বিকেলের পানীয়।

কিন্তু সুখের কপাল নিয়ে পীরজাদা পৃথিবীতে জন্মায়নি। জন্ম মুহূর্তে মা–র মৃত্যু থেকে তার শুরু। এমন কিছু লোক আছে যারা নিজের দুর্ভাগ্য নিজে বানায়, তাদের বানাতে হয়, স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়। পীরজাদা সেই দলের মানুষ।

সেদিন বিকেলে এসে স্ত্রীর হাত থেকে পানীয় নিয়ে চুমুক দিতেই মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল তার। স্ত্রী হেসে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? খাও।

পীরজাদা অপ্রস্তুত হয়ে আরেক চুমুক পান করে টাই খুলল। খুলতে খুলতে ভাবল, আজ কি এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্যে তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, ফলে বিস্বাদ লাগছে এই পানীয়? না, তেমন কিছু তো হয়নি। বরং আজ একটা ভালো দিন বলা যেতে পারে। কাজে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য, মনোযোগ; বাইরে বাতাস ছিল সুন্দর, পথে ছিল না তিলমাত্র ভিড়। তবে? পীরজাদা আবার গ্লাসটা হাতে নিল। এক চুমুকে বাকিটুকু নিঃশেষ করবার জন্যে হাঁ করল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পেল স্ত্রীর ঠোঁট কাঁপছে। চোখ এক পলকের জন্য বিস্ফারিত হল; আতঙ্কে বরফ হয়ে গেল মেয়েটা হাত থেকে গ্লাস নামালো পীরজাদা—-হয়ত চোখের ভুল, হয়ত গ্লাসের মধ্য দিয়ে দেখেছে বলে অমন মনে হয়েছে। ভালো করে দেখবার জন্যে হাত থেকে গ্লাস নামালো পীরজাদা।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক বিস্ময়। তার স্ত্রী প্রায় দৌড়ে, অস্পষ্ট একটা কাতরোক্তি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে হাতের গ্লাস হাতে রইল পীরজাদার যেন চলমান ছবি স্থির হয়ে গেছে।

পাশের ঘরে এসে দেখে স্ত্রী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত মুখ তার শাদা হয়ে গেছে, দরদর করে ঘাম পড়ছে। পীরজাদা তাকে বুকের মধ্যে নেবার চেষ্টা করল। সে এলো না। জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? উত্তর পাওয়া গেল না। পীরজাদার মনে হলো। হঠাৎ তার বড় মাথা ধরল। সে আবার জিগ্যেস করল, কী হয়েছে? এবারে তার কণ্ঠস্বরে ছিল কিছুটা উত্তাপ। সচকিত হয়ে স্ত্রী তখন তাকে একবার দেখল। বলল, ও গ্লাস তুমি ফেলে দাও। খেও না।

কেন? কী আছে গ্লাসে?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তখন সেও মরে গিয়ে গ্লাসটা আবার হাতে নিল। ভাবলো, তবে কি তার স্ত্রী চায় না সে সুরা পান করে? তা যদি হয়, তাহলে মেয়েটার চোখে আতঙ্ক কেন?

জগতে তেত্রিশ বছর বাস করছে পীরজাদা। আবার সে টাই বাধলো গলায়, জুতো পরল, জ্যাকেট চাপালো এবং গ্লাস থেকে সম্পূর্ণ পানীয় একটা শিশিতে ঢেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত সাড়ে দশটায় অবসন্ন হৃদয় নিয়ে ফিরলো পীরজাদা। হুইস্কিতে বিষ মেশানো ছিল। তার বন্ধু এক ডাক্তার ছিল। ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল। খবরটা পেয়ে পীরজাদার মনে হয়েছিল, এখন আবার সে সম্পূর্ণ গ্লাসটা পেলে পান করে ফেলতে পারত। যেন অনুতাপও হলো তখন তা করেনি বলে। তাকে হত্যা করতে চেয়েছে তার স্ত্রী এ সত্য না স্বপ্ন? কেন তাকে সে হত্যা করতে চাইবে? কেন? টলতে টলতে বাড়ি ফিরল সে।

ফিরে দেখল ঘর শূন্য, স্ত্রী নেই। এটাও যেন আশা করা গিয়েছিল। বিস্ময় তাকে আলোড়িত করতে পারল না। সে রাতে সারা রাত সুরা পান করল পীরজাদা।

দুদিন পরে সন্ধ্যার সংবাদপত্রে এক খবর ছাপা হলো যার সারমর্ম জনৈক ভদ্রমহিলা করাচি থেকে রাতের ট্রেনে পেশোয়ার যাচ্ছিলেন জনৈক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে। পথিমধ্যে ভদ্রমহিলা দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তার পুরুষ সঙ্গীটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভদ্রমহিলা এক স্টেশনের বারান্দায় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তার নাম বলেন বেগম পীরজাদা।

খবরটা বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করলো পীরজাদার বন্ধুমহলকে। তারা টেলিফোন করল, দেখা করতে এলো, খুঁজে বেড়াল পীরজাদাকে। কিন্তু এত কাণ্ড যাকে নিয়ে তাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। একমাস পর পীরজাদাকে আবার হঠাৎ দেখা গেল করাচিতে। তখন সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এই একটা মাস সে কোথায় ছিল তা জানা গেল না। বন্ধুদের সে বর্জন করলো, বান্ধবীদের সতেরো হাত দূরে রাখল। বাসা তুলে দিলো। উঠে এলো

হোটেল কোলামবাসে। প্রথমে তার মনে হয়েছিল বুঝি খুব কষ্ট হবে, কিন্তু কই তাতো হলো না। বরং যেন তার মনে লেগেছে অস্বাভাবিক এক মুক্তির রঙ। এ এমন এক মুক্তি যেন জীবন চলছিল এতক্ষণ সিনেমা হলে শাদা কালো ছোট পর্দার ছবির মাপে, হঠাৎ পর্দা প্রশস্ত হয়ে গেল—-শাদা কালোর বদলে রং দেখা দিল।

আসলে এটাই হচ্ছে পীরজাদার কষ্টের রূপ। একেকটা মানুষের কষ্টের ছবি একেক রকম। এ লোকটা নিজে সচেতন নয় তার কষ্ট এসেছে এই ভাবে। ওটাতো মুক্তি নয়, ও হচ্ছে মৃত্যু। হোটেল কোলামবাসের তেতলায় সর্বদক্ষিণের ঘরে আজ আড়াই বছর ধরে যে মানুষটা থাকে, তাকে দেখে এখন আর এসব কল্পনাও করা যাবে না। এখন, আগেই বলা হয়েছে, সে যদ্দিন না মাটির তলায় যাচ্ছে তদ্দিন নিজেকে মাটির ওপর বাঁচিয়ে রেখে চলেছে।

২. পীরজাদার ইনভাইটেশন ছিল

পীরজাদার ইনভাইটেশন ছিল তার এক ক্লায়েন্টের বাড়িতে। ক্লায়েন্ট ভদ্রলোকের মেজ মেয়ের জন্মদিন। তাকে কিছু মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দেয়া গেল। সর্ব অঙ্গে যৌবন বিচ্ছুরিত মেয়েটা ভারী খুশি হয়েছে ছবিটা এখনো চোখে ভাসছে তার। যে কেউ মনে করতে পারতো উপহারের এই বহর দেখে যে, পীরজাদার চোখ পড়েছে মেয়েটির ওপর। হ্যত তারা মনে করেছেও। পীরজাদার চেয়ে আর কে ভালো জানে এটা হচ্ছে তার ঘৃণার একটা প্রকাশ। যে কোন নিয়ম, নিয়মের কথা শুনলে পীরজাদার আজকাল গা জ্বালা করতে থাকে। তখন সর্বস্ব পণ করে তার ওপর কিশতি মাৎ করতে তৎপর হয়ে ওঠে সে। জন্মদিনে। উপহার দেয়াটা একটা নিয়ম। এ নিয়ম বদলাতে পারবে না পীরজাদা। আর তাই যেন জেদ করে মূল্যবান এক উপহার ছুঁড়ে ফেলে ক্রোধ নেভানো। উপহারটা দিয়েই বেরিয়ে এসেছে সে। এসে বসেছিল একবারে সুরা পান করতে। যখন উঠল, রাত তিনটে। মোড়ের বুড়ো ঝাকড়া গাছটার নিচে ছায়া ছমছম করছে। মনে হচ্ছে শহর থেকে সমস্ত লোক পালিয়ে গেছে মহামারীর ভয়ে।

এলফিনস্টোন স্ট্রীটে দোকানগুলোর শো প্যানেলে এখনো তীব্র আলো জ্বলছে। মূর্তিগুলোর গায়ে পরানো বডিস, শার্ট, টাউজার। কোনটা বন্ধ, কোনটার শুধু উর্ধ্বাঙ্গ। খোলা স্যুটের কাপড় হঠাৎ স্তব্ধ ঝর্ণার মতো ঝুলছে। অতিকায় সিগারেটের টিন থেকে উঁকি দিয়ে আছে জাদুকরের লাঠির মতো সিগারেট। আকাশে নিয়ন বাতির দীপ্তিতে লেখা বিজ্ঞাপন জ্বলছে, নিবছে, জ্বলছে। একটা বিজ্ঞাপনের চারদিকে সহস্র বিন্দুতে খণ্ড খণ্ড লাল বর্ডার নর্তকীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে। বিরাম নেই সে চলার।

পীরজাদা একটা সিগারেট ধরালো। সারা রাতে খাদ্যবস্তু কিছু পেটে পড়েনি এক প্লেট চীনাবাদাম ছাড়া। এখন কিছু খেতে পেলে ভালো হতো। ভাবলো, গাড়িটা ঘুরিয়ে যাবে কোনো হোটেলে। হয়ত এখনো কোথাও ফ্লোর শো হচ্ছে, রান্নাঘরে কিছু থাকতে পারে।

রেক্স সিনেমা পেরিয়ে ফোয়ারার কাছে আসতেই আকাশের দিকে চোখ পড়ল পীরজাদার। সে আকাশে তারার চন্দন ফোঁটা। তৎক্ষণাৎ তার চোখের সমুখে ভেসে উঠলো কল্পনার সেই নিকষ কালো মহিলার মুখ। সে যেন চোখের ইশাবায় ডাকছে। পীরজাদা আর কোন দিকে তাকাল না, ফিরল না, সোজা তার গাড়ি ছুটল হোটেল কোলামবাসের দিকে।

মাসখানেক হলো একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করছে পীরজাদা। আকাশের সেই কাল্পনিক মুখেব কথা মনে পড়তেই আচমকা আরেক জনের কথা মনে পড়ে যায় তার। সে ব্যক্তিটি তার দুকামরা পরের অধিবাসিনী রজনী। রজনীকে প্রথম যেদিন দেখেছিল, সময়টা সন্ধ্যে, চমকে উঠেছিল পীরজাদা। বুকের মধ্যে মোচড় অনুভব করেছিল যেন জন্মজন্মান্তরের ব্যথা। মন হয়েছিল, রজনীর কালো মুখের লাবণ্য দেখবার জন্যেই এতকাল ধরে সে বেঁচে আছে।

পীরজাদা অবাক হয়ে দেখত রজনীকে। ভীরু, নম্র, সচকিতা, তাড়া খাওয়া হরিণীর মতো মেয়ে। বোধহয় অস্পষ্ট করে একটা সাদৃশ্য এবং সান্ত্বনা খুঁজে পেত প্রথম পর্যায়ে তার স্ত্রীর গ্রামীণতার সঙ্গে।

হয়ত সকালে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে রজনী, পদশব্দে চোখ ফিরিয়ে পীরজাদা তাকিয়ে থাকত। তার চোখে কী থাকত কে জানে, রজনীর লজ্জা করত। ঘরে চলে যেত সে তাড়াতাড়ি। বুকের মধ্যে দুপদুপ করত।

তার পালানোটা চোখে পড়েছিল পীরজাদার। তারপর থেকে রজনীর মুখোমুখি পড়ে গেলে পীরজাদাই সরে যেত।

আর রজনীর সঙ্গে যে লোকটা এসেছে, মহসিন, পীরজাদা তাকে হোটেল থেকে রোজ ভোরে বেরুতে দেখত। ওর খুব ইচ্ছে করত দুজনের সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ও এতখানি পরিচিত যে ভয় হতো তাতে করে সবটাই হারিয়ে যাবে। এই যে রজনীকে দেখে তার মনের মধ্যে কেমন একটা উপশম হচ্ছে, শান্তি হচ্ছে, সেটা আর থাকবে না। হয়ত রজনীরা চলে যাবে। আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না এ শহরে।

মেয়েটাকে বোঝা যেতো না। কী যেন ভাবে ও। সারাক্ষণ ভাবে। সারাদিন ওর মনটা কোথায় যেন পড়ে থাকে। পীরজাদা খুব অবাক হতো মানুষের এত তন্ময় হয়ে থাকার ক্ষমতা দেখে।

আর একটা জিনিস বুঝতে পারত না সে। তা হচ্ছে ওরা হোটেলে আছে কেন? দেখে ওদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা হয় তাতে কোন তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে

থাকারই কথা। এখানকার এত খরচ তারা জোগাচ্ছে কি ভাবে? কিন্তু এ ভাবনা তার ভেবে কি লাভ? সে মাথা ব্যথা হোটেল ম্যানেজার ইব্রাহিম বালোচের।

কেবল একদিন কথা হয়েছিল রজনীর সঙ্গে। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল করাচিতে যা সচরাচর হয় না। বারান্দায় এসে পড়ছিল বৃষ্টির ছাঁট। ভিজিয়ে দিচ্ছিল। রজনীর হয়ত মনে পড়েছিল, বাংলায় তার বাসার মধ্যে এমন সব দিনে ছাদের পরে অবাধ স্বাধীনতার কথা। সে বৃষ্টিতে খুব করে ভিজল। মহসিন নিত্যকার মতো বেরিয়েছে কাজের সন্ধানে। ফিরে এসে দেখে রজনীর গায়ে তাপ, জ্বর এসেছে।

রজনী তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি মরে যাবো। আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। বিব্রত হলো মহসিন। বাড়ির উল্লেখ মনের মধ্যে খচ করে বিধলো। বলল, তুমি একটু শুয়ে থাকো, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

অতরাতে মহসিন বেরুলো ডাক্তারের খোঁজে। করাচির কিসসু জানে না চেনে না, ম্যানেজার একটা ঠিকানা দিয়ে দিল, সেইটে নিয়ে সে ছুটলো। এ দিকে ঘরে কাত্রাচ্ছে রজনী। ভুল বকছে। বলছে, আমাকে বাড়ি নিয়ে যাও, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কামরায় ফিরছিল পীরজাদা। ঘরের মধ্যে থেকে মেয়েটার কাতরোক্তি শুনে থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা অনুমান করতে চেষ্টা করল। কিছু বোঝা গেল না। মহনি ঘরে আছে কিনা তাও বুঝতে পারল না। পোর্টারকে ডেকে বলল সংবাদ দিতে। সে এসে জানাল, রজনী একা। জ্বর এসেছে।

ঘরে যাওয়া হলো না পীরজাদার। রজনীর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল, তাও দ্বিধায় মরে গেল। ওদের কামরার সমুখে সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। রজনীর যন্ত্রণা বুঝি আবার বাড়লো। বার থেকে মনে হলো একটা কাটা কবুতর দাপাচ্ছে।

পীরজাদা ভেতরে এসে বলল, পানি দেব?

রজনী তাকে দেখল বড় বড় চোখ মেলে। এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল সে। কী বলল বোঝা গেল না। পীরজাদা তার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। জিগ্যেস করল, জ্বরটা কখন? আপনার স্বামী কোথায়? চোখ দিয়ে একটা ইশারা করল রজনী যার কোন মানে হয় না। পীরজাদা যদি মনের ভাষা শুনতে পেত, তাহলে শুনতে পেত, মেয়েটা বলছে আমার স্বামী কে? যে বিয়ের জন্যে ঘর পালানো, সে বিয়ে তো আমার আজও হয়নি।

পীরজাদা খানিকক্ষণ ছটফট করলো বসে থেকে। মনে হলো জ্বরটা তারই হয়েছে। নিচে নেবে এসে গাড়ি করে তার বন্ধু ডাক্তারটিকে ডেকে নিয়ে এলো দশ মিনিটের মধ্যে। সেই বিষ মেশানো হুইস্কির আড়াই বছর পরে আজ প্রথম বন্ধুটির বাড়িতে তার পদার্পণ। তাই সে তক্ষুণি এলো এবং রোগিনীকে দেখে অবাক হলো। তার কী ধারণা হলো কে জানে, ডাক্তার মানুষ অসুস্থ মানুষের সমুখে ব্যক্তিগত কিছু জিগ্যেস করল না। ওষুধ দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, পীরজাদা আমার সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বোলো।

তখন তার কথা শুনে যে কেউ বুঝতে পারত এ মেয়েটার সঙ্গে পীরজাদার কী সম্পর্ক সেইটে জানবার জন্যে তার কৌতূহল ফেটে পড়ছে। কিন্তু তখন পীরজাদার মাথার মধ্যে রজনীর ব্যথাক্লিষ্ট মুখ; ভাববার মতো মনের অবস্থা তার নেই।

ডাক্তার চলে যাবার পর রজনীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল পীরজাদা। তখন মেয়েটা একটা কথাই উচ্চারণ করেছিল, শুকরিয়া। সেই একটি মাত্র শব্দ যেন সহস্রের অভিধা নিয়ে বাজলো পীরজাদার হৃদয়ে। সে আর কিছু নয়, উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত করে, কোন রকমে বলে গেল, আমি কুড়ি নম্বরে থাকি। বাইরে বেয়ারাকে বলে গেলাম থাকতে। দরকার পড়লে ডাকবেন।

মনের মধ্যে একটা দুরন্ত আশা ছিল, রজনী তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু রজনী কিছুই বলল না। পীরজাদা তার ঘরে ফিরে এসে জেগে রইলো উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে।

না, সে রাতে আর পীরজাদার ডাক আসেনি। মহসিন ফিরে এসেছে, তার কণ্ঠস্বরও শুনেছে। মহসিন ওষুধ নিয়ে এসে দেখে, রজনীর চিকিৎসা আগেই হয়ে গেছে। উদ্যোক্তার পরিচয় বেয়ারার কাছ থেকে পেয়ে খুশিও হতে পারল না, অনধিকার চর্চা বলে ক্রুদ্ধও হতে পারল না। লোকটা যা করেছে তা মানবিক। মানবিকতার এমন এক প্রচণ্ড শক্তি আছে, যে, মালিন্যকে তার সামনে মাথা নত করে থাকতে হয়।

মহসিন যে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি, এটা বোঝা গিয়েছিল তারপরে বহুবার পীরজাদা মুখোমুখি পড়েও একটা কথা না বলা বা ধন্যবাদ না দেয়াতে। এটা লক্ষ্য করে

পীরজাদা মরমে মুষড়ে রইলো, যেন একটা বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে সে। কদিন চোরের মতো পালিয়ে সে ঘর থেকে বেরুতো, ঘরে ফিরত, পাছে সামনে পড়ে যায় মহসিনের বা রজনীর। আর রজনীর উচ্চারিত একটি মাত্র শব্দ শুকরিয়া—-রজনী তার সীমিত উর্দুজ্ঞানে ঐ একটি মাত্র কথাই বলতে পেরেছিল—-সেটা পীরজাদার কানে অমৃতের মতো লেগে রইলো।

তারপর থেকে এমন হলো, হোটেলে ফিরলেই বুকের মধ্যে সে রজনীর অস্তিত্ব টের পেত। এই নতুন অনুভূতিটা বেশ কিছু দিন উপভোগ করলো পীরজাদা। এই সারাক্ষণ মনের মধ্যে কান পেতে থাকা, দূরে বাড়িগুলোর বিন্দু বিন্দু আলোর মধ্যে রজনীর মুখের আভাস সৃষ্টি, হঠাৎ চোখে পড়া রজনীর একটা শাড়ির রং—- সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক মন্ত্রের নিগড়ে যেন বাঁধা পড়ে গেছে সে।

দিন দশেক পরে একদিন বিকেলে রজনী আর মহসিনকে বেরুতে দেখা গেল। পীরজাদা এর আগে কখনো দুজনকে এক সঙ্গে দেখেনি। রজনী পরেছে একটা ছাই রং শাড়ি—- যেন তার গায়ের রং ভোরের আলো লেগে ফিকে হয়েছে। কবরী রচনা করে তাতে দিয়েছে মোতিয়ার বেড়। চলনে ফুটে উঠেছে আন্দোলিত কুসুমের ছন্দ। মুগ্ধ হলো পীরজাদা এবং অনুতপ্ত হলো।

অনুতাপ কারণ, এই প্রথম তার মনে পড়ল রজনী বিবাহিতা। এ সত্যটা জেনেও তার মন এতদিন চাতুরি করে ভুলে বসে ছিল। ধিক্কারে ভরে উঠলো সমস্ত মন। চোখ ফিরিয়ে সে ঘরে ঢুকলো। এ সম্পর্কে আর দশটা মানুষের চেয়ে পীরজাদার ভয়টা ছিল সবচে

বেশি। তার নিজের স্ত্রী অন্য এক পুরুষের প্রেমে পড়ে একদিন তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল বিষ খাইয়ে। ছি ছি করতে লাগল তার আত্মা। চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে থাকবার, নিজেকে সংযত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল, এ তার কী হলো? জীবনের জন্যে, বেঁচে থাকার জন্যে, আবার সে দিশা খুঁজে আবারো কি ডেকে আনবে আরেক মৃত্যু?

পীরজাদা ছটফট করছে। ভাগ্যের পরিহাস, যে কারণে ছটফট সেটা অমূলক। কিন্তু সে কথা সে জানবে কি? এ কথা রজনী ছাড়া আর কেউ জানে না যে, মহসিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি? বিয়ের জন্যে ঘর ছেড়েছিল। হোটেলের ভাড়া করা ঘরে প্রথম রাতেই রজনীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বাসর হয়ে গেছে। মন তো দিয়েছিল, মনের আঁধারটিকেও সমর্পণ করতে হয়েছিল মহসিনের উত্তুঙ্গ ইচ্ছার মুখে। কিন্তু বিয়ে হয়নি।

মহসিন বোঝাতে চেষ্টা করত, দ্যাখো, এটা নতুন জায়গা। কিছু জানিনে শুনিনে, কোথায় কাকে গিয়ে বলবো বিয়ে পড়িয়ে দাও। বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে। হয়নি? বিয়ের চেয়েও এখন যেটা বড়, আমার একটা কাজ দরকার, আমাদের একটা বাসা দরকার—-কই সে কথা তো তুমি আমাকে কিছু বলো না।

শুনে রজনী মরমে মরে যেত। তাইতো, আগে একটা কাজ দরকার। ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত, কাজ না পেলে খাবে কী? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তখন আর কিছু দিশেবিশে না পেয়ে মহসিনের বুকের মধ্যে নিজেকে রেখে সহানুভূতি আর সাহস ঢেলে দেয়ার ভীরু চেষ্টা করত সে।

এই করে চলছিল। কিন্তু রজনী বাংলার মেয়ে। নিয়মাচারের জন্যে তারা আজো জীবন দিতে জানে। মহসিন যেখানে দিনের পর দিন ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসছে কাজের কোন হদিশ না পেয়ে, সেখানে রজনীর তো উচিত ছিল তাকে সাহসে বলীয়ান করে তোলা, তার ইচ্ছার। সমুখে বিনীতা হওয়া। কিন্তু ঘটনো উলটো। যত দিন যাচ্ছে রজনীর প্রেমের গোলাপে কাটার। সংখ্যা বাড়ছে সমপরিমাণে। এই সত্যটা তাকে দগ্ধে মারছে যে, সে তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। সে অনাচার করছে। তার প্রেম বড় নয় তার ক্ষুধা বড় নয়, তার আশ্রয় বড় নয়—-তার সব প্রয়োজনের বড় যে প্রয়োজন সেটা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে।

কিন্তু কথাটা বলতে সাহস হয় না। মহসিন যে অমিত আশা নিয়ে এসেছিল তা নিভে গেছে। না বললেও রজনী এটা এখন স্পষ্ট করে জানে। মহসিন বুঝেছে, তার স্বল্পবিদ্যে এবং শূন্যের মূলধন দিয়ে এমন বড় কিছু করা যাবে না যাতে রজনী ও তার কল্পনার সংসার বাস্তব হয়ে উঠবে। অথচ ফেরবার পথ নেই। একেকদিন কাজ খোজার অছিলায় সারাটা দিন সে কাটায় ক্লিফটনে।

সমুদ্রের গর্জন তবু চিন্তাকে অবশ করে রাখতে পারে খানিকটা। চোখের সমুখে পৃথিবীর একদল হাস্যমুখরিত মানুষ, মেলা, নাগরদোলা দেখে দুর্বহ সময়কে সহনীয় করে তোলা যায়। একেক দিন মহসিনের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় কেন সে রজনীকে নিয়ে এসেছিল? রজনীর ওপর তার ভীষণ রাগ হয়। মেয়েটা কেন আসতে রাজি হলো তার সঙ্গে?

৩. হোটেল কোলামবাস

হোটেল কোলামবাসে এসে গাড়ি থামলো পীরজাদার। রাত তখন সাড়ে তিনটে। দূর থেকে সমুদ্রের ক্ষুব্ধ গর্জন ভেসে আসছে। একবার ভাবলো, ক্লিফটন থেকে বেড়িয়ে আসে। অমন কত রাতে একা একা সে হেঁটেছে ক্লিফটনের বালুবেলায়, কী গাড়িতে চুপ করে বসে থেকে সমুদ্রকে শুনেছে।

আজ একটু বেশি পান করে ফেলেছে পীরজাদা। কেমন যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে। থাক ক্লিফটন।

পোর্টার বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। সালাম করে উঠে দাঁড়াল তাকে তেতলা অবধি পৌঁছে দেয়ার জন্য। পীরজাদা হাতের ইশারায় তাকে নিরস্ত করে একাকী সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে কিছু একটা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করল তার। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। কেবল কতগুলো অসম্বদ্ধ অর্থহীন শব্দ গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে।

রজনীর কামরার সমুখে এসে থমকে দাঁড়াল পীরজাদা। এতরাতেও ঘরে আলো জ্বলছে। স্কাইলাটের কাঁচের ভেতর দিয়ে চৌকো সোনার পাতের মতো আলো পড়ে আছে তার পায়ের কাছে। ভেতরে কোনো শব্দ নেই, সাড়া নেই। পীরজাদা সোনার পাতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। এত রাতে তো কোনদিন ওদের ঘরে আলো জ্বলে না।

মাথার মধ্যে অত্যধিক সুরা ছিল বলেই বোধ হয় সে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একটা যুগও চলে যেতে পারতো। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মৃদু পায়ের শব্দে কান খাড়া করে তাকাল। ঘরের মধ্যে বাতি নিবলো। পীরজাদা তখন চলে যাবার উদ্যোগ করবে, এমন সময় দপ্ করে আবার সেই সোনার পাত এসে তার পায়ের ওপর পড়লো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। বাতি আর নিবলো না।

এসে নিজের ঘরে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা দুলে উঠলো কেয়ামারির সাম্পানের মতো। আলো, চেয়ার, টেবিল, পর্দা, জাগ, সমস্ত কিছু নিয়ে এক প্রচণ্ড টানে সাঁতারুর মতো সোজা তলিয়ে গেল সে ঘুমের ভেতর।

রজনী ভেবেছিল অন্ধকারে শুয়ে থাকতে পারবে। বুকের মধ্যে তো ঢিপঢিপ করছিল। বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো হৃদয়টা এখুনি ছিঁড়ে যাবে ভয়ে। তক্ষুণি আবার বাতি জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যখানে সে দাঁড়িয়ে রইলো। সর্ব অঙ্গ তার থরথর করে কাঁপছে। আরো শঙ্কা হলো যখন বাইরে শুনল পায়ের শব্দ। কে যেন দাঁড়াল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। একবার মনে হয়েছিল, দরোজা খুলে দেখে। কিন্তু সাহস হয়নি। পরে সে শুনল, পায়ের আওয়াজটা একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল, তারপর দরোজা খোলার শব্দ। তখন বুঝলো পীরজাদা ফিরেছে।

সব রাত পোহায়। দুঃখের রাতও শেষ হয়। সূর্য ওঠে। সারাটা রাত জেগে বসেছিল রজনী। রাতের বেলায় তবু সব কেমন যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। দিনের আলোয় তা নিষ্ঠুর সত্য হয়ে ফুটে উঠল।

রাতে শুয়ে ছিল দুজনে। মাঝরাতে পাশে হাত পড়তেই রজনী চমকে উঠেছে। মহসিন নেই। প্রথমে মনে করেছিল বাথরুমে গেছে। কিন্তু পনেরো বিশ মিনিট কেটেছে, সাড়া নেই। তখন সে উঠে বসেছে। নাম ধরে ডেকেছে। সাড়া আসেনি। বাতি জ্বালিয়ে দরোজা খুলে দেখে শাওয়ার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে নিত্যকার মতো সে নেই। সারাটা ঘর। শূন্য। তখন ভীষণ ভয় করলো রজনীর। চোখের সামনে সব দেখেও কিছুই যেন সে দেখতে পারছে না। তার মাথায় কিসসু ঢুকছে না। মহসিন তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে, এ সত্যটা কিছুতেই সে যেন বুঝতে পারছিল না। কেবল কী রকম একটা অতল ভয় করছিল। আর কিছু না।

বেয়ারা এসে সকালের চা দিয়ে গেল। চা স্পর্শ করলো না। কিছুক্ষণ পর ব্রেকফাস্ট আনলো, যেমন রোজ আনে, দুজনের জন্যে। দুজনের ব্রেকফাস্টের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো সে। সব কিছু দুজনের। কিন্তু একজন নেই। মায়ার মতো একবার আশা হলো হয়ত ফিরে আসবে মহসিন। কিন্তু দুপুর হয়ে গেল, সে এলো না।

অবাক হলো বেয়ারা। জিগ্যেস করল, মেমসাব কা তবিয়ৎ কেয়া ঠিক নেহি?

বুড়ো পাঠানের কণ্ঠে এমন একটা মমতা ছিল, রজনীর মনে হলো এখুনি তার চোখে পানি এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি সে কোন রকমে মাথা নেড়ে একটা হা–না গোছের জবাব দিল। বেয়ারা জিগ্যেস করল, সাহেব কি ভোরে ভোরেই কাজে বেরিয়ে গেলেন? তারও জবাব সে দিল না। বরং একটা কথা জিগ্যেস করার ফলে সে যে পরিত্যক্ত এইটে প্রকট

হয়ে উঠলো তার মনের মধ্যে। বুড়ো পাঠান কী বুঝলো কে জানে, ট্রে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। জাগে ভরে দিয়ে গেল নতুন পানি।

সে যাবার পর টসটস করে দুফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রজনীর গালে। তা মুছে ফেলার। কথা মনে হলো না। ফোঁটা হলো প্রস্রবণ। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে কাদলো রজনী। উঠে দাঁড়াতেই জানালা দিয়ে দূরে শহর চোখে পড়ল তার। রুক্ষ ধূসর মাটিতে ছোট বড় দালান, একটা দুটো গাছ, গাড়ি চলছে, কয়েকটা ছেলেমেয়ে স্মার্ট পোশাক পরে রোদের। মধ্যে কুটিপাটি হাসতে হাসতে রাস্তা পার হচ্ছে। এ সবের যেন কোন মানে বোঝা যাচ্ছে না। এ যেন আরেকটা পৃথিবীতে ঘটছে, আর সে, রজনী, তার কোনো শক্তি নেই সেখানে যেতে পারে।

আস্তে আস্তে দরোজা খুলে বেরুলো রজনী। করিডরে কেউ নেই। ইতস্তত করল একবার। চারদিক দেখল। তারপর হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে কুড়ি নম্বরের দরোজায় মৃদু টোকা দিল। বুকের স্পন্দনটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে, তাকে আর কিছুতেই শান্ত করা যাবে না। অনেকক্ষণ পর আবার আঘাত করল দরোজায়। অস্পষ্ট উচ্চারণও করল, শুনুন। তার তখন এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান নেই যে তার বাংলা কেউ বুঝবে না।

ভেতর থেকে এবারে বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর এলো, কাম ইন।

লোকটার কণ্ঠ শুনে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। চলে যাবার জন্যে ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। মুখ ফেরাবে এমন সময় দরোজা খুলে পীরজাদা বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে কে লোকটা দেখবার জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছিল সে। কোনো রকমে উচ্চারণ করতে পারল, আপনি!

রজনীর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে সে আবার শুধালো, আমাকে কিছু বলবেন?

জামার বোতাম ছিল খোলা। পীরজাদা সেগুলোকে কোনো রকমে বন্দি করতে করতে পর্দা সরিয়ে ভেতরে আসবার পথ করে দিল। এবং আশেপাশে মহসিনকে না দেখে উৎকণ্ঠিত হলো। রজনীকে একবার ডাক্তার ডেকে এনে দিয়েছিল বলে লোকটা বিষ চোখে কয়েকদিন তাকে দেখেছে। এখন ঘরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে হয়ত খুন করতে আসবে।

সোফার ওপরে পরিত্যক্ত পোশাক ছিল ছড়ানো। সেগুলো সলজ্জ হয়ে গুছোতে গুছোতে পীরজাদা বলল, বসুন। এ ঘরটা খুব আগোছালো। কিছু মনে করবেন না।

রজনী বসলো না। তার স্বল্প জানা উর্দু আর বইয়ের ইংরেজি মিশিয়ে কোন রকমে যা বলল তার অর্থ—- সে বসবে না, একটা কথা বলতে এসেছে।

নিশ্চয়ই সে কথা বলবে, কিন্তু বসবে না এটা কেমন কথা? অতএব বসতে হলো। কথাটা বলবার জন্যে যে শক্তির দরকার তা সেই মুহূর্তে রজনীর ছিল না বলে বসে পড়া ছাড়া পথ ছিল না তার।

আর পীরজাদা তার ভাষার অস্বাচ্ছন্দ্যে এতদূর অস্বস্তি বোধ করল যে, বাংলা না জানার জন্যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো। বলল, আপনি বলুন আমি বুঝতে পারছি।

রজনী বলল, আমি বড় বিপদে পড়েছি। আপনি ছাড়া এখানে কাউকে চিনিনে। কাল রাত থেকে ওকে দেখছি না।

কথাটা অপ্রত্যাশিত। পীরজাদা প্রথমে কিসসু বুঝতে পারল না। হা করে তাকিয়ে রইল রজনীর দিকে! তা, শ্যামল মুখের ওপর ইতস্তত দ্রুত কী যেন খুঁজে বেড়াল চোখ। বোকার মতো জিগ্যেস করল, কাকে দেখছেন না?

রজনী চকিতে একবার চোখ তুলে চোখাচুখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বলল, ওকে। আপনার স্বামীকে?

রজনী মাথা নিচু করে রইল।

তখন সব কিছু স্পষ্ট হলো পীরজাদার কাছে। পায়ের আসন বদল করে বসলো সে। তখন রজনীকে সম্পূর্ণ করে দেখল। তার ভীত রক্তশূন্য মুখের পরে বেশিক্ষণ দৃষ্টি রাখতে পারল না। করতলে মাথা রেখে ভাবতে চেষ্টা করল পীরজাদা।

আবার যখন চোখ তুলল, দেখল, রজনী তার দিকে ছলোছলো চোখে তাকিয়ে আছে। সে চোখে অবোধ আকুলতা দেখে পীরজাদার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো, বড় অক্ষম

মনে হলো নিজেকে। চকিতে মনে পড়ল তার স্ত্রীর পালানো এবং বীভৎস মৃত্যুর কথা। তখন প্রবল ইচ্ছে হলো, উঠে গিয়ে সমুখে বসে থাকা ঐ ভয়ার্ত মেয়েটাকে নির্ভয় করে তোলে তার শরীর স্পর্শ করে। হয়ত সে উঠেই যেত, কিন্তু বাধা পড়ল।

মনের মধ্যে চাবুক পড়ল যেন। একী করতে যাচ্ছিল সে? রজনীর জন্যে এতদিন দূর থেকে যে দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল, আজ তা–ই যেন আগল ভেঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আরেক মানুষের স্ত্রী রজনী, তার জন্যে এতটুকু মমতা করাও যে পাপ।

যেখানে তার উচিত ছিল রজনীর বিপদ দেখে সাহায্য করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া, সেখানে পীরজাদা স্বার্থপরের মতো নিজেরই মমতাকে প্রকাশ করবার জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে!

স্তব্ধ হয়ে ভাবলো, যদি আজ রজনী না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হতো তাহলে কি সে এতখানি বিচলিত বোধ করত? করত না। অন্য কোনো সময়ে হলে সে এর সিকিও অনুভব করতে। পারত না—-এইটে বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল সে। তার মুখ কঠিন হলো। হৃদয়কে সে পাথর করে তুললো, যে পাথরের হৃদয় নিয়ে সে এই আড়াইটে বছর বেঁচে আছে; বলল, আমাকে মাফ করবেন, আমি কিছু করতে পারব না। আপনার বিপদের কথা শুনে আমি দুঃখিত ও মর্মাহত। আমার কিছু করবার নেই। আপনি ম্যানেজারকে খবর দিন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

শুনে রজনী স্তম্ভিত হয়ে গেল। যে লোকটা তার অসুখে বিনি ডাকে এগিয়ে এসেছিল, সেই একই লোকের সমুখে সে বসে আছে বিশ্বাস হলো না। পীরজাদাকে তার মনে হয়েছিল সহানুভূতিশীল। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তার বিপদের মুহূর্তে অমন রুক্ষ কথা শুনতে হবে। মানুষের ওপর রজনীর যে ভালো ধারণাগুলো ছিল তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। পশুর মতো মনে হলো পীরজাদাকে। উঠে দাঁড়াল রজনী।

পীরজাদা বুঝতে পারল, সে অন্যায় করেছে। সে একচোখা বিচার করেছে। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি যে কর্তব্য তা সে করতে পারল না। ক্ষমাহীন অপরাধ বোধ নিয়ে সেও উঠে দাঁড়াল এবং বিনীতকণ্ঠে বললো, আপনি হয়ত আমাকে অমানুষ ভাবছেন। আমি যে কথাগুলো বলেছি তা কোনো বিশেষ কারণে বলেছি যার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই বুঝিয়ে বলতে পারব না।

তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতাটুকু রজনীকে স্পর্শ করল। তাকে আবার ভরসা করতে মনটা ইচ্ছুক হয়ে উঠল। রজনীর মন থেকে তিক্ততার খানিকটা যেন অপসারিত হয়ে গেল। বলল, আমি আর কাউকে চিনিনে বলেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

আমাকেও আপনি চেনেন না। সে যাক, এখন আমার মনে হচ্ছে ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার দেখা করাই ভালো।

কেন?

সে বিষয়ী মানুষ। প্রথমেই তার মনে পড়বে হোটেলে বাকি বিলের কথা। সেটা আপনার মাথায় আরেক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

রজনী ভাবেনি। এবারে সে চোখে মুখে দিশে দেখতে পেল না। বলল, তাহলে?

একটা কাজ করতে পারবেন? আপনি দোতলায় নেমে ননম্বর কামরায় যান। ওখানে লালা স্বরাজ থাকেন, আমার বন্ধু সাংবাদিক। আমি টেলিফোনে তাঁকে বিস্তারিত জানিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে হয়, সে নিশ্চয়ই একটা কিছু করতে পারবে।

তার সমুখেই পীরজাদা টেলিফোন করল লালা স্বরাজকে। স্বরাজ সৌভাগ্যবশত তার কামরাতেই ছিল। আজ তার ছুটিবার। পীরজাদা নিজে রজনীকে দিয়ে এলো লালা স্বরাজের কামরায়। বসলো না। ঘরে এসে পরপর দুটো নির্জলা বড় হুইস্কি পান করল। রজনীর কথা বারবার মনে পড়ছে অথচ সে মনে করতে চায় না। রজনীর জন্যে তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, অথচ কষ্টটাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

লালা স্বরাজ বাঙালি মেয়ে শুনে উৎসাহ বোধ করল। কিছুদিন হলো বাংলার জন্যে তার একটা অনুরাগ দেখা দিয়েছে। সেটার শুরু রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়ে। কিনেছিল নৃত্যনাট্য শ্যামার রেকর্ড। বুঝতে পারেনি একবর্ণ, কিন্তু ভাষাটার প্রতি ভালোবাসা জন্মে গেল। কেনা হলো সুনীতি বাবুর বাংলা শেখার বই। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি, মানুষ সব কিছুর জন্যে আগ্রহটা প্রবল হলো তার।

এতদিন একটি মেয়ে, বাঙালি মেয়ে এ হোটেলে আছে এটা সে জানে না ভেবে অবাক হলো। সে পীরজাদাকে টেলিফোনে বলল, তুমি এখুনি ওকে নিয়ে এসো।

পীরজাদা এসে রজনীকে পৌঁছে দিয়ে গেল তার কামরায়। আড়ালে ডেকে বলল, থানা পুলিশে খবর দিয়ে অনর্থক হাঙ্গামা বাধানো রজনী পছন্দ করছে না। তুমি সাংবাদিক মানুষ, যে করে হলে হৈচৈ কম হয়, লোকটার সন্ধান এনে দাও।

রজনীকে দেখে প্রথমেই যে কথাটা মনে হলো লালা স্বরাজের তা হচ্ছে মেয়েটা বোকা। শিশুর মতো একটা মমতা মাখানো সারা মুখে। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির ছবি খুঁজে পেল সে। আরো ভালো লাগল, একেবারে নতুন লাগল, তার পরনে নানা রংয়ের বরফি করা তাঁতের সবুজ শাড়িটা।

সাংবাদিক মানুষ লালা স্বরাজ। তার দৃষ্টিই আলাদা। প্রথম পরিচয়ের আবেশটুকু পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে রজনীকে পরিমাপ করল। জিগ্যেস করল, এ হোটেলে কদ্দিন?

দেড় মাস।

করাচিতে এই প্রথম?

হ্যাঁ।

আপনার স্বামী?

রজনী চোখ তুলে তাকাল। বলল, হ্যাঁ।

এতক্ষণে রজনীর মনের মধ্যে একটু সাহস দেখা দিচ্ছে।

লালা স্বরাজ আচমকা প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয় আপনি সত্যি কথা বলছেন?

কোনটা!

যে উনি আপনার স্বামী?

কথাটা বলে লালা স্বরাজ উঠে দাঁড়াল। বেল টিপল। বেয়ারা এলে তাকে চায়ের জন্যে পাঠাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রজনীকে বলল, আমার ধারণা, উনি আপনার স্বামী নন। রজনী প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু কী বলল ভালো করে বোঝা গেল না। বাংলা উর্দু ইংরেজি মিশেলে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। নাজেহাল হয়ে বলল, আমি আপনাদের ভাষায় ভালো করে কথা বলতে পারিনে। আমি কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছি না।

লালা স্বরাজ বলল, আপনি বাংলাতেই বলুন। ইদানীং আমি আপনাদের ভাষা শেখবার চেষ্টা করছি। বলতে না পারলেও মোটামুটি বুঝতে পারি।

কিন্তু রজনী আর কিছু বলতে পারল না। লালা স্বরাজ বুঝতে পারল রজনীর স্বামী নয়। তবু একসঙ্গে একই হোটেলের কামরায় দেড়মাস তারা থেকেছে। রজনীর রূপে নেই প্রখরতা, দৃষ্টিতে নেই বিদ্যুৎ, ভঙ্গিতে নেই আজাদ–জেনানার দম্ভ। রজনী শান্ত, আত্মস্থ, নির্ভরশীলা নারী। তবে কি সে ভালবাসত লোকটাকে? আর এই ভালবাসাই তাকে আকুল করে তুলেছে পালিয়ে যাওয়া লোকটার সন্ধানে সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের কাছে সাহায্য চাইতে? কুণ্ঠাহীনা করেছে? আর লোকটা যদি সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকত রজনীকে, তাহলে পালিয়ে গেল কেন? কেন ওরা এসেছিল করাচিতে? কেন এ হোটেলে উঠেছিল? রজনীর দিকে আবার ভালো করে তাকাল লালা স্বরাজ। কিছুই বোঝা গেল না। তার একটা প্রশ্নেরও উত্তর সেখানে নেই। কেবল লোকটার জন্যে ভালবাসার স্পন্দন যেন মেয়েটার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

এমন কাণ্ড সে জীবনে দেখেনি। ভালবাসার এই পরোক্ষ পরিচয়ে বিস্মিত হলো সে। বলল, কিছু মনে করবেন না। আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। কাল অধিক রাত অবধি কাজ করতে হয়েছে, মাথা গুলিয়ে আছে। আপনার স্বামীর সন্ধান আমি যথাসাধ্য করব। আশা করি সফল হবো। আপনি ঘরে যান। দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন।

রজনী চলে গেলে সে ভাবতে বসলো, সন্ধানটা কিভাবে নেয়া যেতে পারে। মহসিনের চেহারা তার জানা নেই, একটা ছবি পেলে কাজ হতো। তক্ষুণি সে রজনীর কামরায় এসে ফটো চাইল। মেয়েটা অনেকক্ষণ সুটকেস খুঁজল, মহসিনের কাগজপত্র ঘাটলো, কিন্তু ছবি পাওয়া গেল না। বলল, তাহলে?

কোনো রকমে একটা বর্ণনা দিল তার। লালা বেরিয়ে এসে কী ভেবে পীরজাদার দরোজার দিকে গেল। দেখল, ঘর বন্ধ। পীরজাদা বেরিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে লালা স্বরাজ দেখল, তখনো পীরজাদার ঘর বন্ধ। দুপুর থেকে শহরের সর্বত্র তার যেখানে যত বন্ধু আছে সবার কাছে সে ঘুরেছে পুলিশের ছোট বড় কর্তা থেকে শুরু করে হাসপাতাল, হোটেল, বাঙালিদের আড্ডা, ক্লাব, সংঘ কিছুই বাদ রাখেনি। কিন্তু সে নিজেও জানতো, এ করে কিছুই হবে না। একটা সুস্থ সজ্ঞান লোক এত বড় শহরে গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে বার করা শক্ত। হয়ত আদৌ সে এ শহরেই নেই। হয়ত ঢাকা চলে গেছে। কিন্তু গেল কেন রজনীকে ফেলে?

দরোজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এলো রজনী। যেন এতক্ষণ তার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। ভেতরে এসে বসল লালা স্বরাজ। বলল, সে সর্বত্র খবর নিয়েছে। এখনো হদিশ মেলেনি। জিগ্যেস করল, আচ্ছা উনি ঢাকা চলে যান নি তো?

না, আমার মনে হয় না।

আশ্চর্য!

কী?

আপনাকে ফেলে কোথায় যেতে পারেন? আমি হাসপাতালেও খোঁজ নিয়েছি।

মাথার ওপরে বিরাট চক্রের মতো বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় লালা স্বরাজ দেখল রজনী সারাটা বিকেল কেঁদেছে। তার মুখ কান্না শেষে পাথরের মতো ভার হয়ে আছে। সে বলল, আপনি দেশে ফিরে যান।

চমকে উঠল রজনী। দ্রুত মাথা নাড়ল। অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, না, সে হয় না।

কেন?

দেশে আমার কেউ নেই।

কেউ নেই?

যেন প্রতিধ্বনি করে উঠল লালা স্বরাজ।

বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই? আপনার স্বামীর কেউ নেই? তারও কেউ নেই?

না।

সে ভাবল মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু মিথ্যে বলার মতো মেয়ে বলেও মনে হচ্ছে না। একদিকে তার সাংবাদিক মন রহস্য ভেদের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল, অন্যদিকে এই মেয়েটার জন্যে মমতা করতে লাগল, সেই মমতা তাকে বারণ করল মেয়েটাকে আর কোন প্রশ্ন করতে। তার মনে হলো রজনী ভেঙে পড়বে।

জীবন যে কী অসামান্য অগোচর এক শক্তির চক্রে আবর্তিত, উৎক্ষিপ্ত, জটিল হয়ে ওঠে, মানুষ তার এক নগন্য ভগ্নাংশও জানতে পারে না, এ কথা লালা স্বরাজ জানে। তার নিজের জীবনটাও তো ওই। কে তার কতটুকু জানে, তাকে কতটুকু কে বুঝতে পারে? এই মেয়েটার কোমল চোখের সমুখে বসে তার নিজের অতীতের ছবি দেখতে পেল লালা স্বরাজ। তার বাবা ছিল করাচি পোর্টের অসংখ্য ঝাড়ুদারের একজন। ছোটবেলার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। বাবার সঙ্গে সেই ভোরে বেরুতো ভিজে ন্যাকড়া আর বালতিভরা পানি নিয়ে। বাবা ঝাড় দিয়ে যেতেন আর সে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে মেঝে মুছতো। বাবা বলতেন, মুছতে মুছতে যখন নিজের চেহারা দেখতে পাবি তখন বুঝবি কাম ভালো হয়েছে। মেঝেতে নিজের চেহারা সে কোনদিন দেখতে পায়নি। কথাটা ভয়ে বাবাকে বলত না সে।

সারাদিনের কাজ ছিল এই। সকাল দুপুর সন্ধ্যে। একটা দিন হপ্তায় ছুটি মিলত। কিন্তু বস্তি থেকে বেরুনো ছিল তার নিষেধ। বাবা ভয় করতেন, ছেলে অস্পৃশ্যের সন্তান, পথে বেবিয়ে কোথায় কোন ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়াবে, চোখে পড়বে, অভিশাপ কুড়োতে হবে। ভালো করে বুঝতো না স্বরাজ ব্যাপারটা। বাবাকে দেখত বেরুতে। জিগ্যেস করলে তিনি বলতেন, তুই এখনো ছেলেমানুষ, কখন কী করে বসবি, তাই বেরুনো মানা। তখন

নিজেকে হাত পা বাঁধা কুকুরের মতো মনে হতো স্বরাজের। ব্রাহ্মণকে মনে হতো অতিমানব। কল্পনা করত দৈত্যের মতো দীর্ঘ তারা, অসুরের মতো শক্তি তাদের, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুন—-যে আগুন তাকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে সারাক্ষণ লকলক করছে।

রজনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কানে এলো!

কী ভাবছেন?

লালা স্বরাজ তার অতীত থেকে ফিরে এসে ধরা পড়ে যাওয়ার হাসিতে বিব্রত হলো। বলল, কিছু না।

রজনী কী বুঝলো, মন ছোট করে বলল, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আমার জন্যে সারাটাদিন আপনার নষ্ট হলো।

না, না, সে কী?

আপনার কি মনে হয়, ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, কেন যাবে না? তারপর কী ভেবে লালা স্বরাজ যোগ করল, মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেমন কথা? একমাত্র মরে গেলেই মানুষ সত্যি সত্যি

হারিয়ে যায়। বেঁচে যে থাকে তাকে আজ হোক কাল হোক পাওয়া যাবেই। আমার তো মনে হয় উনি নিজেই ফিরে আসবেন। হয়ত আজ রাতেই আসবেন। নিশ্চয়ই কাল রাতে আপনাদের ঝগড়া হয়েছিল?

তার কথা মরমে গিয়ে স্পর্শ করল রজনীকে। পরম একটা নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো তার। সত্যি তো মহসিন আজ রাতেও ফিরে আসতে পারে। বরং এইটেই সম্ভব। রজনীর তখন খুব ভালো লাগল। মনটা তার আরো সহজ হয়ে উঠল। সলজ্জ হয়ে মাথা নেড়ে মুখে বলল, না, ঝগড়া কী!

মানুষ বেঁচে থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই, এই কথা লালা স্বরাজ বলেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি সে কি তা বিশ্বাস করে? তার নিজের জীবনে কি এটা মিথ্যে হয়ে যায়নি। কিন্তু যখন সে বলেছে তখন এত অনুভব করে বলেছে যে তার মন ভীষণ রকমে আচ্ছন্ন হয়ে রইল এক আশ্চর্য কোমলতায়। রজনীকে তার খুব আপন বলে মনে হলো। সুন্দর একটা পরিবেশ রচিত হলো তার হৃদয়ের মধ্যে। সে বলল, সারাদিন ঘরে বসে থাকলে আপনার মন খারাপ করবে যে, কাঁদেন নি তো?

রজনীর ভালো লাগল কান্নার উল্লেখে। লোকটাকে কাছের মনে হলো। সত্যি সে কেঁদেছে। কিন্তু মুখে বলল, না।

তাহলে চলুন, শহরে বেরিয়ে আসবেন। এই সময়টা কার্নিভালের মতো খুশিতে ভরে থাকে বাইরে। যাবেন? আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে এই আধঘণ্টায় রীতিমত পণ্ডিত হয়ে গেছি। কেমন বাংলা বলি বলুন তো?

ভালো।

কি, যাবেন?

সারাটা দিন ঘরের মধ্যে ছটফট করেছে রজনী। কতবার যে উঠেছে, বসেছে, শুয়েছে, হেঁটেছে, দাঁড়িয়ে থেকেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঢাকা থেকে পালিয়ে আসার সময় বুকের মধ্যে যতটা না কাঁপুনি লেগেছিল, আজ সারা দিনে তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা তাকে দুর্বল করে তুলেছে। দুর্ভাগ্য তার নতুন নয়। তিনবার আই এ ফেল করা, কয়েকবার তাকে দেখতে এসে পছন্দ না করা, মা–বাবার বকুনি, এ সব তাকে যথেষ্ট পাথর করে ফেলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যকে দূর করবার জন্যে পেছনে ফেরার পথ বন্ধ করে শেষ বারের মতো যাকে সে অবলম্বন করেছিল, সে চলে যাবার পর আজ সত্যি সত্যি নিজেকে বড় রিক্ত মনে হয়েছিল তার। রিক্ততা যখন চরমে গিয়ে পৌঁছয়, তখন আশ্চর্য রকমে মানুষ মুক্ত বোধ করতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের একটা সহন–সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে দুর্বহ ভারও আর ঠাহর হয় না। রজনীর হয়েছে সেই দশা। তার মনে হলো, জন্মজন্মান্তরে এমন সহানুভূতি সে পায়নি। সে বলল, এখন কি বাইরে বেরুনোর সময় আছে?

নিশ্চয়ই আছে। শহরে বেড়াতে হলে এই তো সময়। প্রকৃতিকে দেখতে হলে দিন, আর শহর—- রাতে। চলুন, আপনার কিছুতেই মন খারাপ করে বসে থাকা চলবে না। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি কাপড় বদলে নিন।

লালা স্বরাজ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বেশ সুন্দর একটা বাতাস দিচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। কেবল উঠেছে। কেবল উঠেছে বলে অনেক বড় আর লাল দেখাচ্ছে চাঁদটাকে; মনে হচ্ছে জন্মের কষ্ট হচ্ছে চাঁদটার। মাঝরাতে যখন আকাশের মাঝখানে এসে পড়বে, তখন ঝকঝক করতে থাকবে, আনন্দের মতো দেখাবে।

একটা চিরকুট লিখল স্বরাজ। লিখল—-আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তুমিও দ্যাখো। তুমিও খোঁজ করো। কেবল আমার ভরসায় থেকো না।

লিখে কাগজটা পীরজাদার দরোজার ভেতরে চালিয়ে দিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

নিচে লনে চেয়ার পেতে কেউ কেউ বসেছে। মনে হচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে শাদা শাদা শরীরগুলো কে যেন এঁটে রেখে গেছে চাবি দিয়ে।

একটা গাড়ি এসে থামল, কেউ নামলো, গাড়িটা গড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে বসে রইল হামা দিয়ে।

মানুষ যদি বেঁচে থাকে তো একদিন না একদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। লালা স্বরাজ অবাক হয়ে ভাবল, যে কথাটা সে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে বহুদিন আগে থেকেই, আজ সেটাই কী করে সে এত বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করতে পারল?

সেই যে সমাজের অস্পৃশ্য হরিজন বলে বাবা বেরুতে দিতেন না, তাতে কী? স্বরাজ ছুটিবারে যেত সায়েবদের বাংলার পেছনে মালি খানসামাদের কোয়ার্টারে। সেখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত একটা নতুন জগৎ। স্বর্গের মতো। ফুলের মতো ছেলেমেয়েরা, তারই বয়সী, খেলছে, লাফাচ্ছে, দৌড়াদৌড়ি করছে। মা তাদের লাল চুলে বো বেঁধে দিচ্ছেন ছেলেটাকে ডেকে গানের মতো গলায় কথা বলছেন। চটপট মাকে কী যেন বলছে সে ছেলে। হাসছে। তার পোকায় খাওয়া দাঁত খুশিতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। খুব ঝিলিক দিয়ে রোদ উঠেছে। মাঠ খুব সবুজ হয়েছে। শাদা হাফ প্যান্ট পরে সায়েব বাগানে ঘুরছেন। বক্লস বাধা কুকুরটা তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে।

এক আধদিন সায়েবের মুখোমুখি পড়ে গেলে চোরের মতো পালাতে চেষ্টা করত স্বরাজ। কিন্তু পরক্ষণেই দেখত, না, তাকে তাড়া করছেন না উনি। বরং কাছে ডেকে প্রথম দিনই নাম পরিচয় জিগ্যেস করেছিলেন; এবং দ্বিতীয় দিনে কুকুরটা একটা বেড়াল দেখে খুব লাফাচ্ছিল, বেড়ালটাকে ধরে বেঁধে দূরে কোথাও ফেলে দিতে বলেছিলেন সায়েব। এ বেড়ালটা জ্বালাত রোজ। একটা কাজ পেয়ে স্বরাজ সেদিন মহাখুশি। তাকে কায়দা করে মাখা রুটির লোভ দেখিয়ে, ধরে, বস্তাবন্দি করে পিঠে ঝুলিয়ে স্বরাজ একটা চলন্ত ট্রাকের ওপর তুলে দিয়েছিল।

এমনি করে চেনা হয়ে উঠেছিল স্বরাজ সেই সায়েব পরিবারে।

এখন ছুটিবারে তার কাজ সায়েবের ছোট দুই ছেলে আর মেয়েটার সঙ্গে খেলার যোগান দেয়া। পাখির ছানা পেড়ে আনা, লুকিয়ে দুপয়সার তেলেভাজা এনে খাওয়ানো, চাচার নতুন মাদল চুরি করে ওদের উপহার দেয়া এই চলছিল। একদিন মেয়েটা, পাঁচ বছরও হবে না, স্বরাজকে ডেকে নিয়ে খেলার ছোট অর্গান দেখাচ্ছিল, উপুড় হয়ে বসে রীডে টুং টুং আওয়াজ করছিল। অতটুকু যন্ত্র থেকে অমন মিঠে সুর বেরুতে পারে দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল স্বরাজ। আরো অবাক হয়েছিল ঐটুকু মেয়ের বাজানোর ক্ষমতা দেখে। তারপর কী হয়েছিল মনে নেই তার। বাঁ কানের ওপর একটা প্রচন্ড থাপ্পর খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। জ্ঞান ফিরলে শুনেছে খানসামা নাকি তাকে দেখেছে সায়েবের মেয়েকে সে বদ মতলবে ফোঁসলাচ্ছিল। দেখে ধাপ্পর মেরেছে। সেই থেকে তার ও বাড়িতে যাওয়া বন্ধ। সেই থেকে বাঁ কানে আজ অবধি কিছু শুনতে পায় না লালা স্বরাজ।

ঐ ঘটনার পর ভীষণ এক আক্রোশ আর জেদ জন্ম নিয়েছিল তার মনে। মনে আছে, বাবা তাকে বেরুতে দিতেন না ছুটিবারেও।

একদিন বাবা খুব সাজ পোশাক করে বেরুলেন। বলে গেলেন, দূরে যাচ্ছেন তিনি। এ দুদিন যেন ভালো ছেলে হয়ে স্বরাজ তার চাচার সঙ্গে ঝাড়ামোছার কাজ করে। বাঁদরামো করলে বেঁধে রাখবেন শুয়োরের খোয়ারে।

পরদিন সকালে চাচার সঙ্গে কাজ করেছে স্বরাজ। চাচা হঠাৎ ঝাড়ু থামিয়ে বলল, এই শুনেছিস, তোর বাবা বর সেজে বিয়ে করতে গেছে।

যাহ।

বিশ্বাস হলো না, না? শালা যখন সত্যার হাতে পয়জার খাবি তখন বিশ্বাস হবে। নে বালতি তোল, কাজ কর।

বলেই পেটে এক লাথি। স্বরাজ বসে বসে মেঝে ঘষছিল, ঘোৎ করে মাটিতে পড়ে গেল। বালতি আঁকড়ে ধরে সামলাতে গিয়ে ময়লা পানিতে টাবুটুবু হয়ে গেল ঘর। তার জন্যে সায়েবের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল চাচাকে। বাবা সত্যি সত্যি বিয়ে করে ফিরলেন। চাচা শোধ নিল কথাটা লাগিয়ে। এমনিতেই নতুন মাকে দেখে ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল স্বরাজ। আর বিয়ের তাড়ি খেয়ে বাবার মেজাজ টং। স্বরাজকে ধরে এমন মার মারলেন, সে সেই যে বাড়ি থেকে বেরুলো আর ফিরল না।

বছর খানেক পশুর মতো এদিক ওদিক ঘুরে দশ বছরের স্বরাজ কী করে দৈবচক্রে পড়ে মালের জাহাজে পৌঁছুলো ত্রিনিদাদ। সেখানে সে বুঝতেও পারল না, এক পাদ্রীর পাল্লায়। পড়ে তার দীক্ষা হলো খ্রিষ্টান ধর্মে। এক রুটির দোকানে চাকরি করতে গিয়ে নিঃসন্তান মালিক তাকে নিলেন দত্তক পুত্র। তারই কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত পড়াশোনা হলো স্বরাজের। রুটির দোকানের মালিক তাকে তার লালা উপাধি ছাড়া আর

কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি। লালা স্বরাজ তার মৃত্যুর পর দোকান বিক্রি করে লণ্ডনে এসে গায়ে গতরে খেটে শিখলো সাংবাদিকতা।

ত্রিনিদাদে যেদিন পা দিয়েছিল সেদিনই সে নিজেকে অনাথ বলে পরিচয় দেয়। লালা বিক্রমদেব তাকে অনাথ জেনেই দত্তক নিয়েছিল। অথচ স্বরাজ জানতো তার বাবা দশরথ আজো বেঁচে আছেন। বাবার জন্যে থেকে থেকে মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত কিশোর স্বরাজ। কিন্তু কাউকে বলতে পারেনি। এটুকু জ্ঞান তার সেই বয়সেই হয়ে গিয়েছিল যে, পিতৃপরিচয় দিলে তাকে লালা বিক্রমদেবের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পথে। না খেয়ে মরতে হবে। সেটা দুকারণে। প্রথমত তার পিতা জীবিত। দ্বিতীয়ত, সে হরিজনের সন্তান। লালা বিক্রমদেব নিজে খ্রিষ্টান হলেও হরিজন থেকে যে ছেলে খ্রিষ্টান হয়েছে তাকে। পুত্র হিসেবে কেন, চাকর হিসেবেও বাড়িতে রাখবেন না।

সাংবাদিকতায় পাশ করে লালা স্বরাজ আর ত্রিনিদাদে ফিরল না। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ফিরে এলো করাচিতে। কাজ নিল এ শহরেই। আর খুঁজল তার বাবা দশরথকে। গিয়ে দেখল, সে। বস্তি কবে উঠে গেছে। কেউ বলতে পারল না দশরথের কথা।

সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় ঘুরেছে, করাচির একটা গলি খুঁজতে বাদ রাখেনি, কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়নি দশরথের। সমাজের যে স্তরে সে আছে, সেখান থেকে কুলি ধাঙড় ঝাড়ুদারের সমাজ অনেক দূরে। এ দূরত্ব হলো তার অনুসন্ধানের আরেক বাধা। মুখ ফুটে সে বলতে পারল না, আমি আমার বাবা দশরথকে খুঁজছি। দশরথের নাম চিহ্ন পরিচয় যেন এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো মুছে গেছে।

আজো সে কোন ধাঙড় ঝাড়ুদার দেখলে দাঁড়ায়। চোরের মতো চারদিক দেখে হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে জিগ্যেস করে দশরথ বলে কোনো বুড়োকে তারা চেনে কিনা। ঠিকানা দেয় নিজের। বলে দেয়, খোঁজ দিতে পারলে পাঁচ শ টাকা দেবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে কেউ আর আসে না। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেছে কেউ আসেনি।

তন্ময় হয়ে ভাবছিল লালা স্বরাজ। পেছনে একটা মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, রজনী। চাপা রংয়ের শাড়ি পরে, সজ্জা করে, চুলের বেণি বুকের পরে দুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নত চোখে। মধুর হেসে স্বরাজকে আপ্যায়ন করল সে। স্বরাজ বলল, অনেকক্ষণ লাগলো।

কই না তো।

শাড়ির আঁচল দিয়ে সারা শরীর ঢেকে কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর করল রজনী। কাজটা দেখে স্বরাজ শুধালো, আপনার কি খুব ঠাণ্ডা লাগছে?

কেন, না।

অমন জড়সড় হয়ে আছেন, তাই বললাম।

না, একটুও না।

বেশতো। তাহলে ভালো করে গুছিয়ে নিন আঁচলটা। বাঙালি মেয়ের শাড়ি পরা সারা বিশ্বের মেয়েরা লুফে নিচ্ছে, আর তার নমুনা এই!

রজনী অবাক হলো। তার সজ্জাই বা কী? যতটুকু আছে তা–ই যে একটা মানুষের মনোযোগ কেড়ে নেবে এটা তাকে সলজ্জ করল। মনটা উসখুস করে উঠল, যেন ভারী অপরাধ করে ফেলেছে সে। মৃদুকণ্ঠে বলল, কেন, এইতো ঠিক আছে।

উঁহু, ঠিক নেই। আঁচলটা অমন করে থাকবে কেন? বড় আনস্মার্ট লাগবে যে। শাড়ি অমন করে পরে নাকি কেউ? বাইরে দেখলে হাসবে।

কারা?

যারা হাসে। পোশাক তো সবাই পরে, তাই বলে সেটা সুন্দর করে পরতে হবে না?

আচ্ছা।

রজনী ভেতরে গিয়ে ঢং বদল করে এলো। এবারে সে আঁট করে পরেছে। হালকা লাগছে শরীর। আর বদলেছে গায়ের জামা। কেমন লজ্জা করছে তার। লালা স্বরাজ দেখে বলল, চমৎকার। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আপনার সব দুশ্চিন্তা গেছে। আগে মনে হচ্ছিল ম্লান, প্রাণহীন। চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লালা স্বরাজ তাকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করল। সংকোচ করতে গিয়ে তা জয় করল রজনী। লোকটার সবকিছুর মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যা বিশ্বাস করতে মন সায় দিচ্ছে। তার মুঠোর মধ্যে রজনীর হাত এতটুকু কাঁপল না।

৪. মনের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড

মনের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড চলছিল পীরজাদার। একবার মনে হচ্ছে, রজনীকে সাহায্য করা উচিত ছিল তার; আবার ভাবছে, নিজেকে রজনীর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে রাখার সিদ্ধান্তই সঙ্গত। আসলে, রজনীর প্রতি তার হৃদয় যে ভীষণ রকমে আকৃষ্ট, এ সত্য থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই এ মানসিক দ্বন্দ্বের অবতারণা।

মানব চরিত্র খুব কম বোঝে সে, নিজেকে তো আরো নয়। পীরজাদা সে অভাব চিরকাল এক অবোধ দুরন্ত অভিমান দিয়ে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

রজনীকে লালা স্বরাজের হাতে তুলে দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া—- এটাও সেই অভিমানেরই কীর্তি। কিন্তু বাইরে এসেও মুক্তি পাওয়া গেল না। মন বসলো না কোথাও। রজনী, মাথার মধ্যে রজনীর মুখ সম্রাজ্ঞীর মতো আঁকিয়ে বসে আছে। এ যন্ত্রণা সুরাপানে মিটল না। এসেলশিয়রে বসে বসে সে পন্থায় ব্যর্থ হলো সে, তখন এলো মেট্রোপলে। কায়রোর মোহিনী নর্তকী রাজিয়া শহরে এসেছে। তার নন্দিত যৌবনের ছবি আজকের কাগজে দেখেছিল পীরজাদা। আজ মেট্রোপলে তার নাচের প্রথম রাত।

স্ত্রীর বীভৎস মৃত্যুর পর এক রজনী ছাড়া অন্য কাউকে দেখে বিচলিত হয়নি পীরজাদা। এটা অন্যায় মনে হয়েছে তার কাছে। এবং তাই এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, নর্তকী রাজিয়ার দেহ। প্রদর্শনী দেখে যদি এতটুকু চঞ্চল হয় তার স্নায়ু, তাহলে পাপবোধের বোঝাটা

খানিক হাল্কা হবে। এ যেন নিজেকে শাস্তি দেয়া; রজনী ছাড়া অন্য কাউকে ভালো লাগবে না কেন—-মনকে এ রকম একটা ধমকানি দেয়া।

বেয়ারা এসে সালাম করল। ডিনারের অর্ডার দিল পীরজাদা। ডিনারে কী পছন্দ করবে সে? তার জবাবে বলল, তোমার রাধুনির আজ যা সেরা, তার সমারোহ দেখতে চাই আমার টেবিলে।

সে ছিল অভিজ্ঞ বেয়ারা। তার নিজের পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়াতে লোকটা গর্বিত হলো, এবং এমন এক স্মিত হাস্যের সঙ্গে প্রস্থান করল যার অর্থ কোনটা সেরা তা আমি জানি, আর আমি যে জানি তা আপনিও স্বীকার করবেন একটু পরেই।

ঠিক তখন আলো স্তিমিত হলো। এক মুহূর্তের ব্যবধানে রণিয়ে উঠলো সঙ্গীত। মৃদু বিচ্ছুরিত নীল আলোচক্রের মধ্যে এসে অভিবাদন জানালো স্বল্পবাস পরিহিতা প্রায় নগ্ন রাজিয়া। তার চোখে নীল সুরমা, মৎসপুচ্ছের অনুকরণে অঙ্কিত তার আঁখিকোণ। রক্তিম বুকের ঊর্ধ্ব থেকে উন্মুক্ত নাভিমূল অবধি এক সূক্ষ্ম সুরমা রেখার কারুকাজ। পীরজাদা তার বিক্ষিপ্ত মন। কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করল। ঐ বিদ্যুতের মত সঞ্চরণশীল শরীরে তার একাগ্র দৃষ্টি স্বর্ণ সন্ধানীর মতো ভ্রমণ করতে লাগল।

খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেছে বেয়ারা। সে খেতে শুরু করল। সেখানেও চেষ্টা করল একাগ্র হতে, খাদ্যের স্বাদ পূর্ণ উপলব্ধি করতে।

স্রোতোধারার মতো হিল্লোলিত হচ্ছে, রাজিয়ার মর্মর শুভ্র কাঁধ। কাঁধ থেকে স্পন্দিত তরঙ্গ নেবে আসছে মরুভূমির জ্যোছনা মাখা বিশাল বালুবীথির মতো দুই স্তনে, সেখানেও স্থির থাকছে না তরঙ্গ, গিয়ে পৌঁছুচ্ছে চিতাবাঘের বুকের মতো দুই ঊষর উরুতে। সেখানে মূর্হিত হচ্ছে এবং পর মুহূর্তে আবার কাঁধ থেকে তার পুনরাবৃত্তি চলছে। চক্রাকারে ঘুরে উঠছে নাভি, যেন তার মধ্য থেকে এখুনি উৎক্ষিপ্ত হবে কামনার ফুল। পরক্ষণে তা স্তম্ভিত হচ্ছে। তখন পদ্মদলের মতো সঙ্গীতের ওপর ভাসছে রাজিয়া। সে লুটিয়ে পড়ছে, তার দুই বাহু শৃঙ্খলিত বন্ধনের ভঙ্গিতে বিলাপ করছে দয়িতের স্পর্শ কামনা করে।

কিন্তু তবু রজনীকে ভোলা যাচ্ছে না। এক মুহূর্তের জন্যে যেন ঘোর লেগেছিল। সেটা স্থায়ী হতে পারল না। খাদ্য বিস্বাদ ঠেকল।

রাজিয়া তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। মেঝেয় গড়াচ্ছে তার সুতনু। ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত গোলাপ পথিকের পায়ে পিষ্ট হতে চায় যেন এই তার সুখের মরণ। একেবারে নিকট থেকে নারী দেহের অনাবৃত জীবন্ত মসৃণতা তার চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলল। চোখের সমুখে যেন কোটি কোটি রক্তমুখ রোমকূপ ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। হাত বাড়াতে গেল পীরজাদা। ঠিক তখন তীরের মতো উৎক্ষিপ্ত হলো রাজিয়ার দেহ। চোখের পলকে অপসৃত হলো দূরতম কোণে।

পীরজাদা উঠে দাঁড়াল। না, এসবে কিছু হবে না। বমি করতে ইচ্ছে করছে তার। গাড়িতে এসে বসলো। এর চেয়ে হোটেলে ফিরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়?

অন্ধকারে স্ফটিক প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে হোটেল কোলামবাস। শহরের এ দিকটা এমনিতেই নির্জন, বাত বারোটা বাজেনি, এরি মধ্যে চলে গেছে সবাই। করিডর, হল, সিঁড়ি, ফুলের টব হঠাৎ বড় হয়ে গেছে যেন।

পীরজাদা অবাক হয়ে ভাবল, মানুষের উপস্থিতি কী দাম্ভিক, সমস্ত কিছুকে তার সমুখে। সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়ে।

শূন্য করিডর দিয়ে যেতে যেতে ডাইনিং হলের পাশে থমকে দাঁড়াল পীরজাদা। নিস্তব্ধ বিশাল হলের শেষ প্রান্তে দুটি মানুষ তখনো বসে আছে। সারা ঘরে আর কেউ নেই। দূর থেকে এতটুকু দেখাচ্ছে তাদের, যেন স্বপ্নের মধ্যে একটা ছবি।

ওরা রজনী, রজনী আর লালা স্বরাজ। রজনী বসে আছে তার দুকনুই টেবিলে তুলে যুক্ত করতলের কাপে চিবুক রেখে। অপরূপ তার সজ্জা। তাতে উগ্রতা নেই, স্নিগ্ধতা আছে। ঐশ্বর্য নেই, দীপ্তি আছে। দুপুরে দেখা রজনীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। যেন মলিন ফুলদানি মার্জিত হয়ে ঝকঝক করছে।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলো পীরজাদা। লালা স্বরাজের ধীর ফিসফিস কণ্ঠ ভেসে আসছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার প্রতিক্রিয়া রজনীর চোখে মুখে ফুটে উঠছে। আগ্রহ এবং লজ্জার এক অপরূপ সমন্বয় রজনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করল সে।

লালা স্বরাজের সান্নিধ্যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কী করে এমন পরিবর্তন ঘটলো রজনীর তা মাথায় ঢুকলো না পীরজাদার। নিজের ঘরে এসে দেখল স্বরাজের চিরকুট পড়ে আছে। তার লেখা মাথার মধ্যে আগুন ছড়ালো। কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল চিরকুটখানা। রজনীর স্বামীকে খুঁজে বার করবার কোনো দায় নেই তার। ঈর্ষার ভীষণ আগুনে দগ্ধে মরতে লাগল সে।

পীরজাদার ভাগ্য বলতে হবে। কারণ ডাইনিং হলে তখন লালা স্বরাজ রজনীকে যা বলেছিল সেটি একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। লালা স্বরাজ তার বাংলা সাহিত্যজ্ঞানের মুখস্ত পরিচয় দিচ্ছিল রজনীকে। তার এক বর্ণ বুঝলেও পীরজাদার ঈর্ষার মাত্রা সহস্রগুণে বাড়তো। সন্দেহ নেই। তবে তাতে করে রজনীর মুখে লজ্জা এবং আগ্রহের মিশ্রিত প্রকাশটি কেন, তা বোঝা যেত। লালা স্বরাজ আবৃত্তি করছিল।

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাত তারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের পরে। স্তম্ভিত সমীরে

রাত্রির প্রহর শেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শ মান হবে তার এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী
তব নবজাগরণী প্রথম যে হাসি
কনক চাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধো খোলা অধরেতে, নয়নের কোণে
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।

রজনী একদিকে অবাক হয়ে গিয়েছিল লালা স্বরাজের বিদেশী জিহ্বা থেকে বাংলা কবিতা শুনে, অন্যদিকে তার মনে হচ্ছিল, এ কবিতার অর্থ কী আর ইঙ্গিতই বা কী লোকটা তা ভালো করে জানে না। যদি জানতো তাহলে অমন নিঃসকোচে আবৃত্তি করে শোনাতে পারত না তাকে। যত স্বচ্ছন্দ পুরুষই হোক না কেন, পয়ারের চোদ্দ লাইন বলে যেতে যে সময় লাগে ততক্ষণ ধরে প্রেমের অমন আকুতি জানানো যায় না। রজনীর কল্পনাক্ষমতা অসীম। সে যেন এতকাল মনে মনে এই নিবেদনেরই ধ্বনি শুনতে চেয়েছিল। লালা স্বরাজের সোনার মতো ভাগ্য। সে নিজের অজান্তে রজনীকে তৃপ্ত করলো। ফলে আবৃত্তি শেষে যখন সে শুধালো, আমার উচ্চারণ কেমন? তখন রজনী আকাশ থেকে পড়ল। স্বপ্নভঙ্গের দুঃখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো সে। লালা স্বরাজ সে চুপ করে থাকার ব্যাখা করল, পরীক্ষায় তার ডাহা ফেল হয়েছে। বলল, আবৃত্তি শুনে

হেসে ফেলেননি, কঠিন মনোবল আপনার। আজ থেকে আমি আপনার ছাত্র। এ কবিতার কোথায় ত্রুটি হলো মনে রাখবেন, শুধরে দিতে হবে।

রজনী হেসে বলল, আচ্ছা। এবারে উঠুন।

ভাগ্যকে চিনতে শিখেছে রজনী। এটুকু তার উপলব্ধি হয়েছে, পরম বন্ধুও বন্ধু নয়। মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে রজনী এখন এত পরিবর্তিত যে তাকে দেখে আর চেনা যাবে না।

অবশ্যি মাথার ওপর দিয়ে ঝড় গেছে। যে গাছটা এতকাল ফুলে ফলে পল্লবিত সবুজ, কালবোশেখীর পর তার পত্রহীন রূপ দেখে অবাক হতে হয়। রজনীর এখন সেই দশা। বেঁচে থাকার দুরন্ত তাগিদে রাতারাতি যেন নতুন পাতার কিশলয় দেখা যাচ্ছে।

হোটেল কোলামবাসের ম্যানেজারকে বুদ্ধি করে লালা স্বরাজ নিজেই জানিয়ে দিয়েছিল, মহসিনকে জরুরি কাজে ঢাকা যেতে হয়েছে। রজনী কিছুকাল থাকবে। ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল প্রায় সাতশ টাকা বাকি। লালা স্বরাজ মনে মনে হিসেব করেছিল, রজনীর ঢাকা ফিরে যেতে লাগবে আরো দুশ কিছু। অর্থাৎ এক হাজার টাকার ধাক্কা।

কথাটা রজনীকে জানাতেই তার মুখ শাদা হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল, এবং স্বরাজকেও বলেছিল, গায়ের গহনা বিক্রি করে সব খরচা মোকাবেলা করা যাবে। হাতে তার খুব বেশি হলে ছিল গোটা তিরিশেক খুচরো টাকা। নিজের প্রচুর খাদ মেশানো হার আর

কগাছা চুড়ি আংটির বদলে বড়জোর তিনশ টাকা আসতে পারে। বাকি টাকা পাবে কোথায়?

তার ভয়ার্ত মুখ লক্ষ্য করে লালা স্বরাজ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। পরামর্শ দিয়েছিল বাড়িতে চিঠি লিখতে। তারা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু রজনী সেদিন মুখ ফুটে বলতে পারেনি, বাড়িতে চিঠি সে কোনদিনও লিখতে পারবে না। তার চেয়ে গলায় দড়ি দেয়া বরং অনেক সহজ ও সুলভ। প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্যে উত্তর করেছিল, হ্যাঁ, সে বাড়িতেই চিঠি লিখবে।

তারপর দুদিন লালা স্বরাজ জিগ্যেস করেছে, বাড়িতে সে চিঠি লিখেছে কিনা? রজনী উত্তর করেছে, হ্যাঁ লিখেছে।

এত সহজে, মুখে কোন চিহ্ন না ফুটিয়ে, মিথ্যে বলার ক্ষমতাটা রজনীর একেবারেই নতুন পাওয়া। ঢাকা সে কোনকালেও ফিরে যেতে পারবে না। ফিরে গেলেও বাড়িতে তার স্থান হবে কিনা সে সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ আছে। স্থান হলেও কপালে যা জুটবে তা মনে করেও শিউরে উঠতে হয়। এদিকে, করাচিতে এমন করেই বা থাকা চলে কদ্দিন? একটা করে মুহর্ত যায় আর রজনীর মনে হয় জীবন থেকে একটা নিরাপদ মুহূর্ত ব্যয়িত হয়ে গেল। করাচিতেই কি তার মৃত্যু হবে? মহসিন চলে যাবার দ্বিতীয় রাতে সে স্থির করল, না, ঢাকাতেই ফিরে যাবে রজনী। তবু বাংলাদেশ। বাবা মায়ের দেশ। নাইবা উঠল সে বাবার কাছে। এই একটা দিনে তার এতটুকু জ্ঞান হয়েছে যে, নারীর একেবারে নিজস্ব অস্ত্রগুলো দিয়ে বিপদের অনেক ব্যূহ ভেদ করাই সম্ভব। ঢাকায় ফিরে

গিয়ে নিজের একটা আশ্রয় খুঁজে পাওয়া হয়ত একেবারে কঠিন হবে না। জীবনে তার বড় কিছু চাইবার নেই—- নিরাভরণ সামান্য হলেই তার স্বর্গ।

কিন্তু আদৌ সে যেতে পারছে কী করে? এই নির্বান্ধব শহরে এক হাজার টাকা তাকে কে দেবে? মনে করে দিশে পেত না রজনী। তখন মন থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলে দুশ্চিন্তা।

তখন লালা স্বরাজের সান্নিধ্য ভালো লাগত। লালা স্বরাজের ঐ একটা গুণ, তার সঙ্গ পেয়ে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। অনেকক্ষণ ধরে এই বিভ্রান্তিটা থাকে যে, তার কিছুই হয়নি। তার সব আছে। তার সংসারে আনন্দের প্রস্রবণ বইছে। এবং এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বরাজের সঙ্গে শহরের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত অবধি ঘুরে বেড়ানো চলছে, কখনো বসছে ক্লিফটনের সেই রেস্তোরাঁর দোতলায়, কখনো এলফিনস্টোনের আলোক মুখরিত বিপণির দরোজায় দাঁড়িয়ে জিনিস এবং মানুষের সমারোহ দেখা হচ্ছে, সেজানের রাত্রিতে টেবিলের দুই প্রান্তে বসে বেহালায় হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত কান্নার মতো সুর শুনতে শুনতে খাওয়া পড়ে থাকছে, লালা স্বরাজের মুখে স্পন্দিত আবৃত্তি শুনে তার আজীবন স্বপ্নের প্রতিবাস সৃষ্টি হচ্ছে—-এ সব মিলিতভাবে তার আড়াল, তার সংকোচ, তার আশংকা সমস্ত কিছুকে কখন তুচ্ছ করে দিয়েছে তা রজনীও ভালো করে বলতে পারবে না।

অন্য দিকে লালা স্বরাজ তার বাংলা প্রীতির তোড়ের মুখে এরকম নিখাদ একটি বাঙ্গালি মেয়ের সঙ্গ পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। রজনীকে নিয়ে সে এরই মধ্যে তার বন্ধুদের

বাড়িতে গিয়ে আচমকা হানা দিয়েছে অবাক করে দেবার জন্যে। পার্টিতে, সিনেমায়, ফেলর শো-তে নিয়ে গেছে রজনীকে জাহির করবার জন্যে। মধ্যযুগের উদ্ধত কিন্তু নারীর কাছে বিনীত সেনানায়কের মতো সে রজনীর ক্ষীণ কটি আভাসে একহাতে বেষ্টন করে বিজয়গর্বে বিচরণ করেছে এ শহরের অভিজাত আড্ডায়।

ফলটা হলো এই, তিনদিন যেতে না যেতে গুজব রটলো, লালা স্বরাজ এক বাঙালিনীর প্রেমে পড়েছে। গুজবটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কানে পৌঁছুলো স্বরাজের। বন্ধুরা জ্বালিয়ে মারল টেলিফোনে। বান্ধবীরা মুখ গোল করে বিস্ময় প্রকাশ করল, অবশেষে বাঙালিকে? গুজবটা পল্লবিত হয়ে এ রকম আকার ধারণ করল—-লালা স্বরাজ গত এক বছর ধরে এ মহিলাকে ভালোবাসছিল, তার প্রমাণ—-গত এক বছর থেকে তাকে বাংলা শিখতে এবং বাংলা গান গুনগুন করতে শোনা গেছে। এতকাল চুপ করে থাকার ব্যাখা তারা করল স্বরাজ সাংবাদিক মানুষ, সংবাদ স্কুপ করে তাক লাগানো যার স্বভাব, তার পক্ষে এই-ই তো। স্বাভাবিক। মোটকথা, সত্য মিথ্যে যাই হোক, দ্রুত প্রচারিত এ গুজব তার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগল না। চতুর্থ দিনে সে অ্যামপিজ-এর দোতলায় বসে খাখা দুপুরে কফি পান করতে করতে রজনীকে তার জীবন কাহিনী বলে ফেলল। সে ইতিহাস শুনে চোখ ছলছল করে উঠলো রজনীর। হয়ত তার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গেছে আচমকা। আঁচল তুলে চোখ মুছতে যাবে, লালা স্বরাজ তার হাত ধরে ফেলল, বলল, একী তুমি কাঁদছ?

মাথা নাড়তে গিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রজনীর। স্বরাজ তার শাদা রুমালে সে অশ্রু ধরে রেখে সযত্নে পকেটে পুরল। বলল, আমাকে করুণা না করে যে গৌরব তুমি দিয়ে গেলে তার যোগ্য নই। আমি হরিজনের ছেলে, আমার জন্যে অশ্রু হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।

রজনী তার উত্তরে বলল, এক সাধারণ মেয়ের অশ্রুকে এত বড় করে দেখলে অহঙ্কারের পাখায় ভর করে সে আকাশে উড়তে থাকবে। সেখান থেকে যদি কোনদিন তাকে মাটিতে নেমে আসতে হয় তো হতভাগিনীর আর দুঃখের অবধি থাকবে না।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো লালা স্বরাজ। পরে বলল, সে দুঃখ কোনদিন আসবে না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

যেন সাপের মাথায় পা পড়েছে, সন্ধ্যের সময় বার থেকে ঘরে এসে শরীর শুদ্ধ চমকে উঠলো রজনীর। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মহসিন নিঃশব্দে হাসছে। অধঃপতিত একটা মানুষের অহংকার হলে যেমন হয়, হাসিটা তেমনি।

উনিশ দিন পরে এই লোকটাকে দেখে রজনীর কী রাগ হলো, না আনন্দ হলো, না বিস্ময়, না ভয়, তা এখনো বলা যাচ্ছে না। শুধু বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো সে।

মাথার চুল রুক্ষ, মুখ মলিন, চোখের কোলে কালিমা, এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ের কাপড় ধোঁয়া পড়েনি কয়েকদিন। সব মিলিয়ে করুণার উদ্রেক হতে পারতো। কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না গা জ্বালানো ঐ নিচুস্তরের নিঃশব্দ হাসিটার জন্যে।

হাত তুলে রজনী বলল, বেরিয়ে যাও।

নিজের কথা নিজের কানে পৌঁছুতেই চমকে উঠলো রজনী। আজ মহসিনকে একথা বলতে হচ্ছে, এর চেয়ে অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত যেন আর কিছু হতে পারে না। এক পলকের জন্যে অনুতাপও হলো। হাতটা নামিয়ে আনলো সে আস্তে আস্তে। অবসন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল, যাও।

মহসিন মুখ থেকে হাসি সরালো। আপাদমস্তক রজনীকে দেখল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। তারপর উঠে এসে তার সম্মুখে একেবারে মুখের কাছে মুখ স্থাপিত করে, শরীর দিয়ে শরীরকে প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়াল। ভয়ে চোখ বুজলো রজনী। ভয় করছে কেন? টের পেল, মহসিন আবার ফিরে গেল। চোখ মেলে দেখল, ফিরে গিয়ে লোকটা চেয়ারের পরে অধোবদনে বসে আছে।

এ উনিশ দিন কোথায় ছিল মহসিন, কিভাবে ছিল, খুব একটা ভালো ছিল না, এসব কথা মনে করে মন খারাপ করল তখন। কিন্তু অবাক হয়ে রজনী তার মনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মহসিনের জন্যে ভালোবাসার এতটুকু আর অবশিষ্ট নেই এ হৃদয়ে। যে লোকটার কথায় একদিন অন্ধের মতো সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল, যে লোকটার মধ্যে তার আশ্রয়, ভবিষ্যত, সুখ, সম্পদ সমস্ত কিছু দেখেছিল সেই একই লোক এই উনিশ দিনে তার জীবনে তুচ্ছের চেয়েও মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাকে ফেলে চলে গেছে বলে রাগ হচ্ছে না, দুঃখ হচ্ছে না, কেনই বা হবে? রজনী নিজেও যেটা বুঝতে পারছে না তা

হচ্ছে, লালা স্বরাজের অন্তরংগ আন্তরিকতা তাকে এমন করে ঘিরে ফেলেছে যে মহসিন কোনো অস্ত্র দিয়েও সে ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না।

বরং মহসিনকে দেখে রজনীর অন্তর চমকে উঠেছিল। তার সুখের দিন বুঝি ফুরালো। লালা স্বরাজ যে পৃথিবীর সন্ধান তাকে দিয়েছে, এত গভীরভাবে সে সেটাকে বিশ্বাস করেছে, যে মহসিনের হঠাৎ আবির্ভাবে অমঙ্গলের সম্ভাবনায় রজনী এখন বিচলিত।

মহসিন হঠাৎ মাথা তুলে বলল, রজনী, আমাকে কিছু টাকা দাও।

কথাটা এত অপ্রত্যাশিত যে রজনীর মনে হলো সে ভুল শুনেছে। সে জিগ্যেস করল, কী? টাকা। নেই?

রজনী বিস্মিত হলো। বুঝতে পারল না তার কাছে মহসিন টাকা চাইছে কেন? মহসিন তো ভালো করেই জানে, তার হাতে একটা পয়সাও নেই। যে গোটা তিরিশেক টাকা ছিল সেটা অনেক বুদ্ধি করে আদায় করা। মহসিন তার ঢাকা থেকে আনা টাকা নিজের কাছেই রেখেছে, নিজে খরচ করেছে। সে টাকা এ দেড় মাস ধরে খরচ হয়েছে। টাকা সম্পূর্ণ খরচ হয়ে গেছে, অথচ কাজের কোন আশা না দেখেই যে সে একদিন পালিয়ে গেছে এ কথাটাও ওর চলে যাবার পরদিনেই বুঝতে পেরেছিল রজনী। বরং সে তার পরম সম্পদ, তার লজ্জা, রাতের পর রাত হরণ করে পালিয়েছে। একটিবার ভাবেনি তার কী হবে। সে কথা মনে করে ভীষণ আক্রোশ হলো রজনীর। সে যদি গলায় দড়ি দিত, তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতো মহসিন। এত বড় সর্বনাশ করবার পরও লোকটা

আবার এসেছে তার কাছে, টাকা চাইছে, শুনে গা জ্বলতে লাগল রজনীর। মহসিন যে স্পষ্টই অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, পশুর মতো কোথাও পড়ে রাত পার করছে—- এটা তার চেহারায় লেখা দেখা যাচ্ছে। তবু রজনীর দয়া হলো না এতটুকু। সে বলল, আমি কোথায় টাকা পাবো?

কেন, লালা স্বরাজের কাছ থেকে।

হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল রজনীর। হাতে চাবুক থাকলে পশুপেটা করত লোকটাকে। নেই বলে অসহায় দুহাত মুঠো হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল তার। বেরিয়ে যাও, আমি চিৎকার করবো নইলে। পশু একটা পশু। তোমার কিছুতে বাধে না, কিছুতে আটকায় না।

থামলে কেন?

আর কিছু বলার প্রবৃত্তি আমার নেই।

আমার আছে।

কী বলবে?

দাঁড়াও।

মহসিন একটা সিগারেট বের করে ধরাল। প্রচুর একটা টান দিয়ে ওটাকে নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, জানতাম তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে। তাই ফেলে গিয়েছিলাম। একটা কথা কী জানো, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে সুবিধে অনেক। শালার। একেক সময় ভাবি মেয়ে হয়ে জন্মালাম না কেন? লালা স্বরাজের মতো পাঁঠার কাছ থেকে একটা পয়সাও খসাতে পারোনি এটা কেমন কথা? বোকার মতো রাতে শুয়ে থাকলেই হলো? মালকড়ি বানাবার এইতো বয়স। কিছু পয়সা ছাড়ো। তারপর হাই তুলে বলল, দুদিন গোসল হয়নি। একটু হাত পা ছড়িয়ে গা ধুয়েনি। কী বল? শ খানেক হলেই আপাতত আমার চলে যাবে। বলে মহসিন বাথরুমের দিকে গেল। দরোজা খুলে কী ভেবে মুখ ফিরিয়ে বলল, পীরজাদার তো বেশ লোভ ছিল তোমার ওপর। তার নাকে দড়ি দিতে পারলে গ্র্যাণ্ড হতো। ব্যাটাছেলের প্রচুর টাকা। যা ওড়ায়।

দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেলে বাথরুমের দরোজা। মিনিট খানেক পরে অঝোর ধারে পানি পড়া শব্দ।

রজনী একবার ভাবলো, নিচে গিয়ে ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে আসে। পরক্ষণেই মনে হলো, সে ভদ্রলোক মহসিনকে তার স্বামী বলে জানে, জানে সে ঢাকা গেছে। স্বামীর আবার অনধিকার প্রবেশ কী?

অবাক হলো এই ভেবে, কারো চোখে না পড়ে মহসিন হোটেলে তার কামরায় এসে ঢুকলো। কী করে? রজনী লালা স্বরাজের কথা চিন্তা করল। তাকে গিয়ে বললে কেমন হয়? মহসিনকে দেখে লালা স্বরাজ হয়ত বিনীতভাবে বিদায় নেবে। একদিনেই রজনীর জানা হয়ে গেছে, ভেতরে বাইরে স্বরাজ খাঁটি ভদ্রলোক; ঘরে চোরকে দেখে পেটানোর বদলে দরোজা খুলে দিয়ে বলবে, আপনি ভুল করে অন্য কামরায় ঢুকেছেন।

মহসিনকে দেখলেই লালা স্বরাজ নিশ্চিত ধরে নেবে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মহসিন রজনীকে তার আগে ভালোবেসেছে, অতএব অগ্রাধিকার তারই।

মহসিনের মুখে পীরজাদার উল্লেখে লোকটার কথা বেশ কদিন পর মনে পড়ল। স্বরাজের সঙ্গ পেয়ে সে ভুলে গিয়েছিল এ লোকটার অস্তিত্ব। এক কারণহীন অপরাধবোধে ভরে উঠল তার মন। মনে হলো, পীরজাদাকে সে প্রতারিত ও ক্ষুণ্ণ করেছে।

রজনী ঠায় বসে রইলো সোফার পরে। বাথরুম থেকে অবিরাম জলধারার শব্দ ভেসে আসছে। আজ সারাটা দুপুর তার কেটেছে লালুখেতে স্বরাজের এক বন্ধুর বাসায়। সেখানে তাদের দুজনের ছিল দুপুরের খাবার নেমন্তন্ন। সাজানো গোছানো দুটি মানুষের সেই সোনার সংসারে বিকেল অবধি কাটিয়ে রজনীর মন স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো। তারও সংসার হবে, এমনি সংসার, আর লালা স্বরাজ। বলতে গেলে, লালা স্বরাজকে তার জীবন মৃত্যুর বন্ধু হিসেবে কল্পনায় আজ এই প্রথম স্পষ্ট করে সে এঁকেছে। সে ছবি এখন একটা উদ্যত কুৎসিত হাতে যে কোনো মুহূর্তে আর্তনাদ করে পড়বে মাটিতে।

মহসিন বেরিয়ে এলো। সে শুধু গোসলই করেনি, তার পরিত্যক্ত রেজার ব্লেড বের করে দাড়ি কামিয়েছে, একটু সুগন্ধও মেখেছে বুঝি, মৃদু বাস দিচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল রজনীর। অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

মহসিন তাকে চকিতে দেখে নিয়ে বলল, ভয় পাওয়া তোমার শোভা পায় না রজনী। তুমি অযথা ভয় পেয়েছ। তোমার সুখে বাদ সাধতে আসিনি। চলে গিয়েছিলাম পরোক্ষভাবে সেটা মঙ্গলের কারণ হয়েছে। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে নিশ্চয়ই।

চুপ করো। চেঁচিয়ে উঠল রজনী।

মহসিন বলল, সবটা শোনো। অন্তত করাচি আসবার প্লেন ভাড়াটা আমাকে দাও।

করাচি আমি আসতে চাই নি।

হাসল মহসিন।

না এলে আমার কী সাধ্য ছিল জোর করে আনি। এতবড় মেয়েকে লজেন্স দেখিয়ে ভোলানো যায় না, হাত ব্যাগে পুরেও হাওয়া হওয়া যায় না।

তুমি যাবে?

টাকা দিলেই যাবো।

কিসের টাকা?

বাহ, তুমি থাকবে সুখে। আর আমি না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরবো?

তাই মরো।

কথাটায় মহসিন কানও দিল না। বলে চলল, ভালোই হয়েছে। কী বল?

কী ভালো হয়েছে?

এই তুমি যা করছ।

কী করছি আমি? কী করছি? বলো কী করছি?

চটে গেল মহসিন। মুখ বিকৃত করে বলল, ন্যাকা। কিছু বোঝো না? জিগ্যেস কর নিজেকে কী করছ। কাপড় খুলে দ্যাখো কী করছ। আরো বলতে হবে? দাও, টাকা দাও।

নেই।

নেই?

থাকলেও দেব না।

তাহলে আছে?

তোমার লজ্জা করে না?

লজ্জা তো তোমারও করতে পারত। সে যাক, লালা স্বরাজকে নাচাচ্ছ নাচাও। ও বোধহয় জানেও না। তোমার পেটে আমার ছেলে বড় হচ্ছে। জানে?

মুখ শাদা হয়ে গেল রজনীর। ঠোঁট কেঁপে উঠল মৃত্যুর মুখে প্রজাপতির মতো। কিন্তু কিছু বলবার মতো শক্তি পেল না। স্পষ্ট সে বুঝতে পারল, এ লোকটা তার সর্বনাশ করতে উদ্যত, যদি সর্বনাশের আরো কিছু বাকি থাকে। বোকার মতো যে প্রাসাদ সে কল্পনায় গড়ে তুলেছিল, এই একটা কথার উচ্চারণে তা ধূলোয় মিশে যাবে। ভয় হলো স্বরাজকে গিয়ে এখুনি হয়ত সে বলবে। স্বরাজের কাছে সে যে বলে বসে আছে, মহসিন তার স্বামী নয়, কেউ নয়। স্বরাজ যে জানেও না, রজনী মিথ্যে করে বলেছে মহসিন তার দেহস্পর্শ করেনি বলেছে, সে পবিত্র।

রজনী মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কোনো রকমে গলা থেকে হার খুলে হাতে দিয়ে বলল, তুমি যাও।

চট করে হারখানা পকেটে পুরে মহসিন দরোজা খুলে গলা লম্বা করে দেখল ডানে বামে। তারপর সুরুত করে বেরিয়ে গেল।

রজনী বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি। মাথার পরে হাতের ছোঁয়া পেয়ে চোখ মেলে দেখে চোখ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে লালা স্বরাজ। এত ভালো লাগল, চোখ বুজলা, আবার। কয়েক মুহূর্ত পরে বোধ করি ফিরে আসতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। স্বরাজ বলল, দরোজায় নক করে সাড়া পেলাম না। খেতে হবে না? সাড়ে নটা রাত হয়েছে।

ম্লান হাসল রজনী। শাড়ি মুখ কুন্তল দ্রুত সংযত করতে করতে উঠে গেল। স্বরাজ বলল, সাড়া না পেয়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কী হলো? দরোজা খুলে দেখি ঘুমিয়ে আছে। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

বসুন।

রজনী বাথরুমে ঢুকলো মুখ মার্জনা করতে। স্বরাজের কথা কানে বাজতে লাগল। পাশাপাশি মনে হলো মহসিনের কথা। একটা মানুম থেকে আরেকটা মানুষ কত

বিপরীত পশু আর দেবতা। বেরিয়ে এসে রজনী বলল, আমাকে এ হোটেল বদল করতে হবে।

কেন?

স্বরাজ বিস্মিত হয়ে তাকাল তার দিকে।

কেন? কী হয়েছে?

স্বরাজ যে এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে তা ভাবেনি সে। তাকে যে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই তখন হাসল রজনী। বলল, কিছু হয়নি তো। এমনি। এমনিতেই ভালো লাগছে না।

কেউ কিছু বলেছ?

স্বরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগল রজনীর মুখে। তার হঠাৎ মনে পড়ল পীরজাদার কথা। পীরজাদা তো কিছু অঘটন করে রাখেনি? স্বরাজের আরো সন্দেহ হলো এই ভেবে যে, পীরজাদাকে এ তিন সপ্তাহ ধরে খুব কম দেখা যাচ্ছে, ঘরে টেলিফোন করে জবাব পাওয়া যাচ্ছে না, তার সমুখে পড়লে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু জিগ্যেস করলে আমতা আমতা করছে, এবং রজনীর কথা সে একবারও জানতে চাইছে না। যে রজনীকে পীরজাদা নিজে এনে দিয়েছিল তার কাছে, রজনীর প্রসঙ্গে সেই পীরজাদারই

পাথরের মতো নীরবতা লালা স্বরাজকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সরাসরি সে রজনীকে জিগ্যেস করে বসল, পীরজাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

রজনী আয়নার সমুখ থেকে প্রসাধন শেষ করে তার কাছে এসে বলল, না না, উনি কি বলবেন? ওঁর মত মানুষ হয় না। কেউ আমাকে কিছু বলে নি।

চিন্তিত হয়ে বসে রইলো লালা স্বরাজ। রজনীর জন্যে কী করা যেতে পারে ভাবতে ভাবতে কখন তার কপালে কুঞ্চন রেখা জেগে উঠেছে তা সে নিজেও জানে না। সেটা চোখে পড়ল রজনীর। সে বুঝলো তার চলে যাওয়ার কথা শুনে স্বরাজ হয়ত ভাবছে, এ তাকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা ছল, সত্য কথার দ্র পোশাক। তাই তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে অ্যাশট্রেতে নিবিয়ে দিল। লাইটারটা তুলে দিল। বলল, একটা কথা বললে এমন করে ভাবতে থাকেন, আমার আর কথা বলাই চলে না। আপনি বললে, এখানেই থাকব। ভাবছিলাম শুধু শুধু কত খরচ। সস্তা কোথাও হলে ঋণটা কমতো।

আজ সকালে রজনীর হোটেলের বিল সম্পূর্ণ শোধ করে দিয়েছিল সে। ইঙ্গিতটা তারই। লালা স্বরাজ উঠে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, তোমার মনটা আজ ভালো নেই রজনী। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও মেঘে ভরে গেল। ঋণের কথা তুললে কেন?

রজনী শুনে অপ্রতিভ হলো। ডাইনিং হলের জন্য বেরিয়ে এলো দুজন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনস্থির করল স্বরাজ। এই মেয়েটার কোথায় যে কী কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে

পারছে না, কী করলে বোঝা যাবে তাও ঠাহর করতে পারছে না। সে বলল, রজনী, চলো আজ আমরা বাইরে যাই।

কেন, বাইরে কেন? সারাদিন তো বাইরেই কাটলো।

তাতে কী? জানো রজনী, করাচিতে রাতের একটা খুব সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আছে, ভারী সুন্দর, এখন তোমাকে বলব না, চলো আজ দেখাবো। অনেকদিন আগে একদিন অধিক রাত্তিরে মোটরে করে আসতে আসতে আবিষ্কার করেছিলাম। কাজ করে ফিরছিলাম।

তার কথার ধ্বনিতে শিশুর মতো এক আগ্রহ রণিয়ে উঠলো। ছড়িয়ে পড়ল তা রজনীর মধ্যে। উজ্জ্বল চোখে সে বলল, কী সুন্দর হবে! না?

বীচ লাক্সারিতে বসে খেলো ওরা। দূরে সমুদ্রের গর্জন পৃথিবীর আলো কোলাহলের মধ্য দিয়ে অবিরাম পার হতে হতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসে ভেঙে পড়ছে তাদের চারধারে। সমুদ্রের তীরে এখানে ওখানে গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা দুটো করে বাতি জ্বলছে। নোনা হাওয়া দিচ্ছে মুখের পর।

হঠাৎ কাঁটা রেখে স্বরাজ শুধালো, তোমার গলার হার কই?

গলায় অজান্তে হাত ওঠালো রজনী। পরক্ষণে সে নামিয়ে নিল। মৃদু গলায় বলল, খুলে রেখেছি।

অলংকার তোমার ভালো লাগে না?

এইতো ভালো।

রজনীর লাজুক উত্তরটা মধুর লাগলো তার কাছে। চারদিকের জলুস ভরা মুখরা মেয়েদের পাশে রজনীকে অনেক রমণীয় অনেক দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। স্বরাজ বলল, এইতো সত্যি ভালো। তুমি আমার ভেতরটাকে এমন করে বদলে দিচ্ছ রজনী, মনে হচ্ছে এতকাল যা জানতাম, বুঝতাম, সব মিথ্যে। আমি কিছু দেখিনি, বুঝিনি—- তোমার মধ্যে নতুন করে সব দেখলাম, বুঝলাম।

মনে মনে শিউরে উঠল রজনী। তার হারের ইতিহাস যদি কোন রকমে টের পায় স্বরাজ, প্রলয় কাণ্ড হয়ে যাবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে ট্যাসি নিল ওরা। ড্রাইভারকে স্বরাজ বলল, গুরু মন্দিরের দিকে চলো।

পেছনের সিটে গা ঘেসে বসল দুজন। মুখের পর এই আলো এসে পড়ছে, ঐ পড়ছে না; একটা মোড়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়াচ্ছে, তখন মাথার উপর বিজ্ঞাপন বাতি থেকে লাল-সবুজ আলো পালা করে রজনীকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, দিচ্ছে না, দিচ্ছে—-যেন একটা বিরাট মঞ্চের পর নাটকের চরিত্রে সে; তিনটে মাকরানী জোয়ান হেঁটে যাচ্ছে অলস পায়ে,

তাদের একজনের কাঁধে টিয়ে পাখি, পাখিটা চলার তালে তালে দুলে দুলে উঠছে, একটা বোরকা পরা মেয়ে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো; আরেকটা মোড়ে আণ্ডারগ্রাউন্ড করিডরের মুখে রেলিং ঘেরা ফাঁকা স্কোয়ারে শুয়ে আছে ভিখিরি ভবঘুরে; দুটো লোক খাঁটিয়া টেনে এনে বসে অন্ধকারে ফুকছে সিগারেট; দাঁড়ানো খালি স্কুটারে উঠলো এক পাঠান, ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে মিটারের ফালগ নামিয়ে দিল; তাদের ট্যাকসি মোড় নিল, মোড় নিতে গিয়ে আরেকটা পাখিকে চকিতে পাশ কাটাতেই রজনী টাল সামলাতে পারল না। স্বরাজের কাঁধের ওপর তার শরীর গিয়ে পড়ল। কোথা দিয়ে কী হলো বুঝতে পারল না রজনী। তার মনে হলো স্বরাজ তাকে দুহাতে ধরে ফেলল। স্বরাজের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঝংকৃত হয়ে উঠল রজনীর গাত্র সুবাস।

ঠোঁট থেকে ঠোঁট বিচ্ছিন্ন করে রজনী তার কাঁধের পর মুখ রেখে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। স্বরাজ বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টিত করে কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলো দ্রুত অপসৃয়মাণ দালান ল্যাম্পপোস্ট ফুটপাথের দিকে। যেন তারা ঝড়ের মধ্য দিয়ে অতি নিরাপদে একটা জাহাজে চড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছে।

ডানে, ডান দিকে যাও।

রজনী চোখ বুজে শুনলো স্বরাজ তাদের ট্যাসিকে থেকে থেকে নির্দেশ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর রজনীকে জড়ো করে তুলে সে বলল, দ্যাখো।

রজনী তাকিয়ে দেখে তারা চওড়া নির্জন রাস্তা দিয়ে দুধারে অগুনতি প্রাসাদের মতো বাড়ি ফেলে ছুটে চলেছে। আকাশে অনেক তারা উঠেছে। স্বরাজ বলল, এটা হচ্ছে শহিদ—এ–মিল্লাত রোড, বন্দর রোড থেকে ড্রিগ রোডে গিয়ে পড়েছে। সমুখে দ্যাখো, যা তোমাকে দেখাবো বলেছিলাম, আসছে।

পাথরের উঁচু নিচু অসমতল কেটে গড়ে উঠেছে সারাটা এলাকা। ট্যাসি ছুটছে বাতাস কেটে। দৃশ্যপটের মতো তারায় ভরা আকাশ নেবে এসেছে উইণ্ডস্ক্রীন ভরে। দুদিকে অন্ধকার। যেন সোজা ছুটে চলেছে তাদের ট্যাকসি ঐ তারার দিকে।

স্বরাজ বলল, ঐ রজনী।

ঠিক সেই মুহূর্তে অপসারিত হলো আকাশ; ঘটলো ইন্দ্রজাল; নক্ষত্রের বদলে উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে দেখা গেল পায়ের নিচে আলো জ্বলা এক শহর ছবির মতো অপরূপ বিছিয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়া শিবিরের মতো দেখাচ্ছে। আসলে এতক্ষণ তারা যে সমতল ধরে আসছিল তা এখানে এসে হঠাৎ ঢালু হয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে বানানো পথ দিয়ে নামছে তারা। সে পাহাড়ের গায়ে গায়ে উঠেছে দালান, একেবারে দূরে নিচে ঐ সানুদেশ অবধি। যেন জাদুবলে গুহার দরোজা খুলে সঞ্চিত বিক্ষিপ্ত হীরক–ঐশ্বর্যের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারা। যেন একটা রুদ্ধ দুয়ার কার পরশে মন্ত্রবলে গেছে খুলে। এই বিশাল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রজনীর হৃদয় প্রথম হলো স্তম্ভিত। পরে মনে হলো তার ভেতরটা এত বিশাল হয়ে উঠেছে যে সমস্ত পৃথিবীর, জীবনের সব ভালো–মন্দ, জয়–পরাজয়, করুণা–প্রীতি, তুচ্ছ–মহৎ সব কিছুর স্থান হবে সেখানে।

স্বরাজ বলল, এই পথটার এরূপ প্রথম যে রাতে দেখলাম, আমার ভেতরটা এত বদলে গেল, তার এক কণাও বলে বোঝাতে পারব না। মনে হলো, আমি সব পেয়েছি। আমার দুঃখ নেই, মালিন্য নেই, স্বার্থের আর্তনাদ আমার তুচ্ছ, জীবনের বিচিত্র বিরাট আমার সমুখে। যেন আমার নতুন জন্ম হলো। এমন করে আর কখনো কারু জন্ম হয়নি। যেন আমার তীর্থে আমি পৌঁছেছি। আমার ধর্মে প্রভু জেসাস যে শান্তিময় পৃথিবীর প্রতিজ্ঞা বারবার করে গেছেন, মনে হলো সে পৃথিবী আমার পায়ের নিচে, একেবারে হাতের কাছে। মনে হলো হাত বাড়িয়ে গেলেই ছুঁতে পারবো। মনে হলো, প্রতিটি দীপ আমার জন্যে জ্বলছে। মনে হলো, প্রতিটি ঘর আমার ঘর।

লালা স্বরাজের এ রূপ আগে দেখেনি রজনী। একেবাবে অন্তর থেকে হেঁকে তোলা একটা অনুভূতিকে এত কাছে থেকে এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি সে। যেন তার হৃদয়ের মধ্যে মুখ রেখে ফিসফিস করে কথা বলছে স্বরাজ। তার সঙ্গে এতটুকু দূরত্ব নেই আর। চন্দনে কুসুমে কখন ভাগ করে নিয়েছে স্বর্গের সোনা।

স্বরাজ তার কণ্ঠের পরে হাত রেখে বলল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে রজনী?

.

বৃহস্পতিবার তাদের বিয়ে। সে রাতের একদিন পরেই। এত তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না, কিন্তু রজনীর প্রয়োজন ছিল। তার ভয় হচ্ছিল আবার যে কোনদিন মহসিনের আবির্ভাব ঘটতে পারে।

বিয়ের পরই তারা চলে যাবে এ হোটেল থেকে। বাসা নেবে। রজনী তার সংসার সৃষ্টি করবে। বৃহস্পতিবার সকালে কোর্টে বিয়ে হয়ে গেলে পর তারা আর ফিরবে না হোটেলে। এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কটেজ আছে হকস বে'তে। সেখানে হবে তাদের মধুচন্দ্রিমা।

মাঝের এই একটা দিন স্বপ্নের মধ্যে কেটেছে রজনীর। এ দিনটা সে ইচ্ছে করেই দেখা করেনি লালা স্বরাজের সঙ্গে। এটা তাদের বোঝাঁপড়া হয়ে ছিলো যে, এ দিনটা আর দেখা হবে না। স্বরাজ নেবে ছুটি, নিজেকে সে প্রস্তুত করবে। আর রজনী থাকবে তার কামরায় একাকী, সেখানে সে বিশ্রাম নেবে—-আত্মার, শরীরের। দুজনের কাছেই ভারী ভালো লাগছিল এই সিদ্ধান্তটা। যেন একটা দিন দূরে থেকে, অদর্শনের মধ্য দিয়ে, পরস্পরের জন্যে অধীরতাটুকু আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে।

সারাটা বুধবার শান্ত সুন্দর হয়ে রইলো রজনীর অন্তর। প্রচুর অবসর যেন তার হাতে, শ্রীমণ্ডিত নির্ভর যেন তার সমুখে, রাণীর ঐশ্বর্য তার দুহাতের মধ্যে। সকালে উঠে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলো সে বিছানায়। কতদিন পরে গান গাইতে ইচ্ছে করল তার। ছোটবেলায় মার। মুখে গুনগুন করতে শোনা সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা মনে পড়ে মনের মধ্যে রণিয়ে রণিয়ে উঠতে লাগল তার সুর। উঠে এসে

সোফার ওপর উপুড় হয়ে অপটু গলায় অনেকক্ষণ ধরে সেটা গাইলো। শুয়ে শুয়ে খেলো ব্রেকফাস্ট। তারপর জানালা। খুলে পায়ের নিচে উজ্জ্বল ব্যস্ত শহর দেখল। পাম গাছের দীর্ঘ ছায়া খাটো হতে হতে একেবারে শেকড়ের চারপাশে এসে যখন বন্দি হলো তখন নাইতে গেল রজনী। নেয়ে উঠে নতুন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো মন। দেহ থেকে প্রসাধনীর মৃদু সুবাসে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো ইন্দ্রিয়।

বিকেলে আবার গিয়ে দাঁড়াল জানালার পারে। কোথাও বেরুবে না, তবু প্রসাধিত সজ্জিত করল নিজেকে। কাল সকাল দশটার এখনো অনেক বাকি। তবু কাল কিভাবে সজ্জা করবে, কেমন করে বেরুবে এই ভাবনা ভাবতে বসলো তার মন।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

৫. খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো লালা স্বরাজের। আজ বৃহস্পতিবার। আর কঘণ্টা পরেই দশটা। এত ভোরে কোনদিন ওঠেনি সে। ঘরেই তো ফেরে রোজ রাত তিনটের আগে নয়। কাল রজনীর কথামত ছুটিতে কেটেছে। ঘুমিয়েছিল বারোটার মধ্যে। জেগে উঠে বুকের মধ্যে রিমঝিম করতে থাকল তার। স্বর্গে থাকেন বিধাতা পুরুষ। মর্তের মানুষের সঙ্গে এককে সময় তার পরিহাস করতে ইচ্ছে হয়, এরকম কথা শোনা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেল কোলামবাসের এই ননম্বর কামরায় যা ঘটলো তাকে হয়ত দশটা মানুষ মিলে সেই পরিহাসই বলবে। কিন্তু লালা স্বরাজের কাছে তার ব্যাখ্যা অন্য রকম। ব্যাখ্যা থাক, যা ঘটলো তা এই।

গোসল করে এসে চা খেতে খেতে সকালের কাগজ পড়ছিল সে। আজ তার মন বসছিল না। কোন সংবাদে। চঞ্চল চোখ এ পাতা ও পাতায় ভেসে বেড়াচ্ছিল, একই লেখা সতেরোবার দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট্ট একটি সংবাদ। সে সংবাদে লেখা, গতকাল বিকেলে করাচিতে আসছিল হায়দ্রাবাদ থেকে লোকাল। তার পাদানি থেকে ফসকে পড়ে দশরথ নামে আনুমানিক পয়ষট্টি বৎসরের এক দরিদ্র বৃদ্ধ হরিজন গুরুতর রূপে আহত হয়েছে। তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে আশঙ্কাজনক অবস্থায়।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বরাজ। দশরথ? দশরথ যে তার বাবার নাম

যে বাবাকে ফেলে সে ছোটবেলায় পালিয়ে গিয়েছিল, যে বাবাকে সে গত পাঁচ বছর ধরে করাচির বস্তিতে বস্তিতে খুঁজে বেরিয়েছে। তার বাবা বেঁচে থাকলে তো আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের হতেন। তিনিই কি আসছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে? উত্তেজনায় সারা শরীর কেঁপে উঠলো লালা স্বরাজের। কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হওয়া স্বভাব নয় তার। এ বৃদ্ধ তার বাবা নাও হতে পারেন। দশরথ নামে রামায়ণের যুগ থেকে আজ অবধি কোটি কোটি মানুষ জন্ম নিয়েছে।

তবু দুর্ঘটনার কথা শুনে তার মনের মধ্যে কেমন করে উঠলো। কী জানি হয়ত হাতের কাছে এসে হারিয়ে যাবে। তবু তো নামের মিল রয়েছে, এ মিলটুকুও সে গত পাঁচ বছরে খুঁজে পায়নি।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল সাতটা বাজে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসা যাবে। হয়ত রজনী এখনো ঘুম থেকেই ওঠেনি।

পোশাক পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সে হোটেল থেকে। বুড়ো পাঠান পোর্টারের সঙ্গে দেখা হলো সিঁড়ির মুখে। তাকে বলল, মেম সাহেব আমার কথা জিগ্যেস করলে বোলো আমি এক্ষুণি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল না স্কুটার, ট্যাকসি। একটা টাঙ্গা যাচ্ছিল। সেটাকে থামিয়ে উঠলো। স্বরাজ। কিছু দূরে গিয়ে একটা খালি ট্যাসি চোখে পড়তেই চিৎকার করে সেটা থামাল। বসলো তাতে। ট্যাসি ছুটে চলল রেলওয়ে হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালে এ সময় ভিজিটর আসা নিষেধ। তার সাংবাদিক কার্ড দেখিয়ে মুক্তি পাওয়া গেল। খোঁজ পেতে পেতে লাগল মিনিট পনেরো। অবশেষে তেতলার এক চার–বেড। কামরায় তাকে নিয়ে এলো ওয়ার্ডেন।

দরোজায় পা দিয়েই লালা স্বরাজ দেখল বেড খালি। আসলে তিনটে বেড খালি ছিল, সেই তিনটেই আগে চোখে পড়েছে তার। আবার যখন ভালো করে তাকাল, দেখল, ডান দিকের বেডে ফিরে শোয়া একটি দেহ। সমস্ত দেহ কম্বলে ঢাকা। মুখের যতটুকু প্রকাশিত কেবল। শাদা চুল দেখা যাচ্ছে। তার শরীর এমন শান্তিতে ডুবে আছে যে এ কেবল অধিক মর্ফিয়াতেই সম্ভব।

ডাক্তার জানাল, একটা পা হাঁটুর ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে প্রচুর।

লালা স্বরাজ ধীরে ধীরে বেডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করল তার মুখ দেখতে। ভালো করে দেখা গেল না। তখন সে ঘুরে তার ফেরানো মুখের সমুখে। এসে দাঁড়াল।

একটা পলক। কিসসু দেখতে পেল না স্বরাজ। কিংবা দেখল পথে ঘাটে দেখা হাজার হাজার ধাঙড় ঝাড়ুদার ভিখিরিদের একটা মুখ। হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল তার। পরক্ষণে একপাল ঘোড়ার পদক্ষেপে বিচূর্ণ হতে থাকল তার সমস্ত অনুভূতি। সেই মুখ, চিবুকের নিচে সেই গভীর কাটা দাগ, গলায় সেই রূপোর মাদুলি! তার বাবা। তার ঝাড়ুদার বাবা,

যে বাবাকে সে খুঁজে বেরিয়েছে পাঁচটি বছর। তিনি শুয়ে আছেন মর্ফিয়ার আচ্ছন্ন করা ঘুমে। কালো ত্বক বয়সের ভারে আরো কালো হয়েছে, কুঞ্চনে ভরে গেছে মুখ, চিবুকের হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরো। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলো পিতার দিকে সন্তান। যেন পঁচিশ বছরের অদর্শনের বিরাট ফাঁক কয়েক মুহূর্তের হাহাকার ভরা দৃষ্টিতে ভরে তুলেছে স্বরাজ। সে একবার হাত রাখতে গেল জ্ঞানহীন দশরথের শরীরে, ফিরিয়ে আনল, বিমূঢ়ের মতো তাকাল চারদিকে। কোনো রকমে ডাক্তারকে বলতে পারল, বাঁচবেন?

এখনো বলা যাচ্ছে না। কে লোকটা? ডাক্তার স্বরাজকে দেখে নিয়ে আবার শুধালো, আপনার বাড়িতে কাজটাজ করত নাকি?

শুনে তার ভীষণ ক্রোধ হলো। চমকে উঠলো সারাটা অন্তর। নিজেকে সংযত করে চোয়ালের হাড় দৃঢ় করে সে উচ্চারণ করল, আমার বাবা।

ও মাই গড। অস্ফুট বিস্ময়-ধ্বনি বেরুলো ডাক্তারের কণ্ঠ থেকে। অবাক হয়ে সে একবার পিতার দিকে দেখল, একবার পুত্রের দিকে।

আধঘন্টার মধ্যে হোটেলে ফিরতে চেয়েছিল স্বরাজ। কিন্তু হোটেলের কথা তার আর মনে রইলো না। মনে পড়ল না রজনীর কথা। আজ দশটার সময় তার বিয়ে, রজনী তার জন্যে। তৈরি হয়ে বসে থাকবে—- এসব কিছুই যেন তার জীবনে ঘটবার কথা ছিল না। সে নিষ্পলক বসে রইলো দশরথের পাশে। ডাক্তার আসছে, যাচ্ছে, নার্স সেবা করছে,

ওষুধ দিচ্ছে, ইনজেকশান হচ্ছে ছবির মতো সব ঘটে যাচ্ছে তার চোখের সমুখে। একটা শব্দ তার। কানে যাচ্ছে না। ওদের একটা কথার মানে সে বুঝতে পারছে না।

সারাটা দিন বসে রইলো সেখানে। নাওয়া–খাওয়া কিছুই হলো না। কেবল মনে হলো, সে উঠে গেলেই ফাঁকি দিয়ে তার বাবা স্বর্গে যাত্রা করবেন। যেন সে বসে আছে বলেই এখনো তার মৃত্যু সম্ভব হচ্ছে না।

বিকেলের দিকে একটু জ্ঞান হলো দশরথের। যেন একবার চোখ মেলল। উদগ্রীব হয়ে স্বরাজ ডাকল, বাবা। চোখ বন্ধ করল দশরথ। সে শুনতেও পেল না। আবার সে ডাকল, বাবা।

রাত নটার সময় পরিপূর্ণ চোখ মেলল দশরথ। দেখল, একটি অপরিচিত মুখ। কোমরের নিচ থেকে সব শূন্য লাগছে, কোথায় যেন যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না, মাথার মধ্যে চোখে দেখা সব কিছু টলছে, স্থির হয়ে আবার টলছে।

সে বলল, বাবা, আমি স্বরাজ।

কে?

দশরথের কাছে দূর থেকে চেনা মনে হলো নামটা। যেন বহুঁকাল আগে ভিড়ের মধ্যে কোথাও শুনেছিল। অজান্তে তার হাতটা উঠে এলো, কাঁপতে কাঁপতে স্পর্শ করল স্বরাজের চোখের কোল।

স্বরাজের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। সে অশ্রু দশরথের শিথিল আঙুলের ডগা সিক্ত করে দিল। আলোর প্রতিফলনে একখন্ড দীপ্তি হয়ে উঠলো সে অংশটুকু। হাতটা পড়ে গেল। বিছানার পরে। লালা স্বরাজ সে হাত তার আকুল মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, বাবা, বাবা, তুমি শুনছ, তুমি চিনতে পারছ না? বাবা, আমি স্বরাজ। আমি স্বরাজ। আমি রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। বাবা, আমি স্বরাজ।

দশরথ তার কণ্ঠ শুনল কিনা বোঝা গেল না। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মুখে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করববার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। আধ ঘণ্টা পরে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলো।

তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো অপারেশন কামরায়। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো স্বরাজ। অস্থির পদচারণা করতে করতে সে জেসাসের ছবি মনে করবার চেষ্টা করল। পাগলের মতো প্রার্থনা করতে লাগল। দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঈশ্বরের সিংহাসন টলিয়ে দশরথের জীবন ভিক্ষা সে চাইলো। মুহুর্মুহ উত্তর্ণ হয়ে উঠলো। আবার সে প্রার্থনা করল।

আবার তাকে নিয়ে আসা হলো বেডে। দশরথ যেন পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে স্বরাজ তাকাতেই সে বলল, এখনো বেঁচে আছেন। আমরা চেষ্টা করছি।

আশান্বিত হয়ে সারারাত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে জেগে রইলো স্বরাজ। আশা, কখন চোখ মেলে সে ছেলেকে চিনতে পারবে।

রাত চারটে ছাপ্পান্ন মিনিটে ঘুমের মধ্যে মারা গেল দশরথ। যন্ত্রের মতো বুকে ক্রশ করলো লালা স্বরাজ। তবু বিশ্বাস হলো না। তবু যেন আশা ফুরাতে চায় না। নার্স দেহটাকে যখন কম্বলে ঢেকে দিল তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলো।

আমার পিতাকে তুমি স্বর্গে নিও, যেমন তুমি সবাইকে তোমার অসীম ক্ষমার মধ্য দিয়ে স্বর্গে নেবে। আমরা যারা জীবিত, আমাদের যেন অহংকার না হয়। একমাত্র তোমার নিকটেই সান্ত্বনা। তোমারই এ রাজ্য, সর্বক্ষমতা, সর্বগৌরব। আমেন।

.

আর রজনী? সারাটা দিন সে প্রতীক্ষা করল স্বরাজের জন্যে। দশটা বেজে গেল তবু সে এলো না, তখন তার প্রসাধনে প্রস্তুত দেহ, অনুভবে সম্পন্ন হৃদয়, আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। ভাবলো এই হয়ত সে এসে যাবে, রাজার মতো এসে দাঁড়াবে স্বরাজ তার দুয়ারে। লজ্জা করল, নিজে গিয়ে খবর নিতে। সে যে আজ বিয়ের কনে।

এগারোটা পেরিয়ে গেল তবু যখন স্বরাজ আসেনি, তখন সে কম্পিত চরণে নিচে নেমে দেখে ননস্বর কামরা বন্ধ। বুকের মধ্যে আগুনের মোহর পড়লো যেন তার। স্বরাজ যে কাগজে কাজ করে সেখানে টেলিফোন করে সন্ধান পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি ওপরে এসে নিজের ঘরে বসে বুকের পরে হাত রেখে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল রজনী। স্বরাজ কি শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পালটে পালিয়ে গেল মহসিনের মতো? নিজের পোড়া কপালটার কথা মনে করে পাগলের মতো হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো তার। ইচ্ছেটা এত তীব্র, হৃদপিণ্ড ফেটে পড়বে যেন।

বুড়ো পাঠান এসে জানিয়ে গেল, সাহেব বাইরে গেছেন, বলে গেছেন একটু পরেই ফিরবেন। তার কথা কানেও গেল না রজনীর। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সে। মলিন হতে লাগল তার মুখের রং। খসে পড়ল কপালের কুঙ্কুম। পাণ্ডুর হলো কবরীর মোতিয়া-মালা। বেলা গেল, তবু স্বরাজ এলো না।

কিসসু ভাবতে পারল না মেয়েটা। ভাবনার উৎস যেন তার বিকল হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় হয়েছে পাথব। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইলো। না অতীত, না বর্তমান, না ভবিষ্যৎ কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারল না।

সন্ধ্যের ঠিক আগে যখন সমস্ত ঘরটা একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে, আর রজনীর মনে হচ্ছিল তার মৃত্যু হচ্ছে, ঠিক তখন দরোজায় টোকা পড়ল।

হৃদয় লাফিয়ে উঠলো দুরাশায়। দরোজা খুলে দেখল, মহসিন।

মহসিন। দুয়ার খুলে চেনা এই লোকটার মুখ একেবারে রজনীর চোখে দুর্বার তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়লো যেন।

এক মুহূর্তে কী হলো তার মনের মধ্যে, মহসিনের বুকের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেষ্টন করে তাকে দুহাতে আঘাত করতে করতে অশ্রু জড়ানো বিকৃত কণ্ঠে সে বলতে লাগল, তুমি আমার শত্রু। আমাকে কেন ভালবাসলে? কেন চলে গেলে?

বিহ্বল হয়ে গেল মহসিন। রিক্ত, সর্বস্বান্ত, বিপন্ন অস্তিত্ব এই লোকটা কিসসু বুঝতে পারল না। রজনীর খোলা এলো চুল, বিস্ফারিত চোখ দেখে সে ভয় পেলো, অপরাধী বোধ করল নিজেকে। আজো সে টাকা নিতে এসেছিল রজনীর কাছ থেকে। রজনীর ওপর দিয়েই দুঃখের দিনগুলো পার হবে ভেবেছিল। কিন্তু তা তলিয়ে গেল কোথায়। সেদিন যে বিশ্রী কথাগুলো রজনীকে বলেছিল, সেটা তো ছিল তার পালিয়ে যাওয়ার পর প্রথম আবির্ভাবের সংকোচ আর অপরাধের বিরুদ্ধে একটা বর্ম। আজ সে বর্ম ভেঙ্গে গেল খানখান হয়ে। সে খোলা দরোজার মুখে রজনীকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে উচ্চারণ করল, রজনী, আমি বাসা করেছি, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমি আর কোথাও যাবো না, রজনী।

বাসার কথাটা অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে মহসিনের। তার বাসা কোথায়? তার বাসা তো পথ। কিন্তু রজনীকে বুকের মধ্যে নিয়ে, তার কান্নার জন্যে মিথ্যে ছাড়া আর কিছুতে সান্ত্বনা দেয়ার কথা সে ভাবতে পারল না।

নিজেকে মুক্ত করে রজনী বলল, চলো, আমাকে এখুনি নিয়ে যাও।

মহসিন হাত ধরলো তার। দৃপ্ত ভঙ্গিতে রজনী সিঁড়ির দিকে এগুলো। খোলা দরোজা পড়ে রইল খোলা। মহসিন তাকে নিরস্ত করবার মতো সাহস পেল না খুঁজে। কেবল বলল, তাই চলো।

.

তখন যদি ওরা একবার পেছনে ফিরে তাকাতো, দেখতে পেতো, একেবারে দক্ষিণে বাতি নেভানো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ একটা মানুষ তাদের দেখছিল। সে লোকটা দেখেছে রজনী মহসিনের আলিঙ্গনে বাঁধা। দৃশ্যটা চোখে পড়তেই তার হৃদয়ে তীরবিদ্ধ হবার যন্ত্রণা হয়েছিল। মুমূর্ষ মানুষের মতো সে তাকিয়ে দেখেছে ওদের। তাকিয়ে দেখেছে রজনীকে। দেখেছে মহসিনের সঙ্গে তাকে চলে যেতে।

যেন তার জীবন থেকে অপসারিত হলো সূর্য।

রজনী চলে গেলে পীরজাদা তার ঘরে এসে দাঁড়াল। মাথা নত করে কী ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। এ কসপ্তাহ রজনীকে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, আজ রজনী যখন নিজেই চলে গেল তখন হৃদয় ধাবিত হলো তারই দিকে। কিছুতেই ফেরানো যাচ্ছে না। অথচ রজনীকে অবাধে যেতে দিতে হয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত একটা মানুষের মতো নিশ্চলতা নিয়ে সে দেখেছে তাদের দুজনকে।

দ্রুত একটা চিঠি লিখল পীরজাদা। সেটা লালা স্বরাজের ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বেয়ারার হাতে দিল। তারপর দরোজা বন্ধ করে আলমিরা খুলে দেখল চার বোতল হুইস্কি এখনো আছে। নামিয়ে আনলো বোতল চারটে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি রেখে খুললো সব কটার মুখ। নিভিয়ে দিল বাতি। তখন বাইরের অস্পষ্ট আলো ঘরের মধ্যে বেলে জ্যোছনার মতো ছড়িয়ে পড়ল লাফিয়ে। তখন উন্মত্তের মতো মাথা পেছনে ঠেলে হাঁ করে একটার পর একটা বোতল থেকে পান করতে লাগল ঢকঢক করে।

.

শবদাহ করে সকাল নটার সময় হোটেলে ফিরল লালা স্বরাজ। এসে সোজা গেল রজনীর ঘরে। দরোজা ঠেলে দেখল, তালা বন্ধ। নিচে নেমে এসে শুনলো, কাল সন্ধ্যের সময় সে চলে গেছে।

কোথায়?

বলতে পারল না কেউ। ম্যানেজারেব কাছে জিগ্যেস করেও কোনো লাভ হলো না। কেবল এইটুকু শোনা গেল, মহসিনের সঙ্গে গেছে রজনী। নিজেকে তখন ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো তার। পৃথিবীতে এই একটা বন্ধন ছিল—- তার বাবা। তাকে দাহ করে এসে নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি অবশিষ্ট নেই।

নিজের ঘরে এসে দেখল, মেঝেয় একটা চিঠি। হয়ত রজনীর চিঠি। হাতে নিয়ে পীরজাদার হাতের লেখা চোখে পড়ল তার।

স্বরাজ, বন্ধুত্বের অনেক ঋণে তুমি আমাকে আবদ্ধ করেছ। আজ একটা অনুরোধ করব। আমি হয়ত মরতে যাচ্ছি, আমার দেহ তুমি গুজরানওয়ালায় পাঠিয়ে দাও। তোমার কল্যাণ হোক।

বোকার মতো চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলো স্বরাজ। দৌড়ে তেতলায় এসে পীরজাদার দরোজা ঠেলে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ। উন্মত্তের মতো আঘাত করতে লাগল সে দরোজায়। ভেতর থেকে খুলে দিল না কেউ। আবার সে আঘাত করল, আবার, আবারও।

ম্যানেজারকে ডেকে এনে দরোজা খুলে লাশ বার করা হলো পীরজাদার। মেঝের পরে শূন্য চারটে বোতল। প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ লুটিয়ে ছিলো পা সোফায়, মাথা মেঝেয়, চোখ বিস্ফারিত, মুখে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের একত্রিত এক অর্থহীন অসীম বিরক্তি।

আর কিছু না। লালা স্বরাজ একদিনে দেখল দুটি মৃত্যু, আর একটি মানুষের হারিয়ে যাওয়া। বুকের পরে ক্রশ করতে ভুলে গেল সে এবার।

সেদিন রাতে সে অফিসে বসে সংবাদ লিখল তার টাইপরাইটারে—-কাল রাতে ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা গেছে পীরজাদা।

যে লোকটার জীবন ছিল বিড়ম্বিত, যে লোকটা ছিল তার বন্ধুদের অসীম করুণার পাত্র, সে আত্মহত্যা করেছে এ সংবাদ ছেপে তাকে আরো করুণার পাত্র করতে পারলো না লালা। স্বরাজ। টাইপ শেষ করতে করতে দেখল, ভালো করে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আচমকা চোখে হাত দিয়ে দেখল, চোখ পানিতে ভরে আছে। সম্ভবত লালা স্বরাজ ছিল পীরজাদার একমাত্র বন্ধু।

করাচী, পাকিস্তান
১৯৬৩